দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

হায়দার আলি ও টিপু সুলতান কোনোভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না — পৃঃ ১৩

স্ট্রিট স্লোগানেই পথ হারালো মাওবাদ — পৃঃ ২৩

৭৮ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।। ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

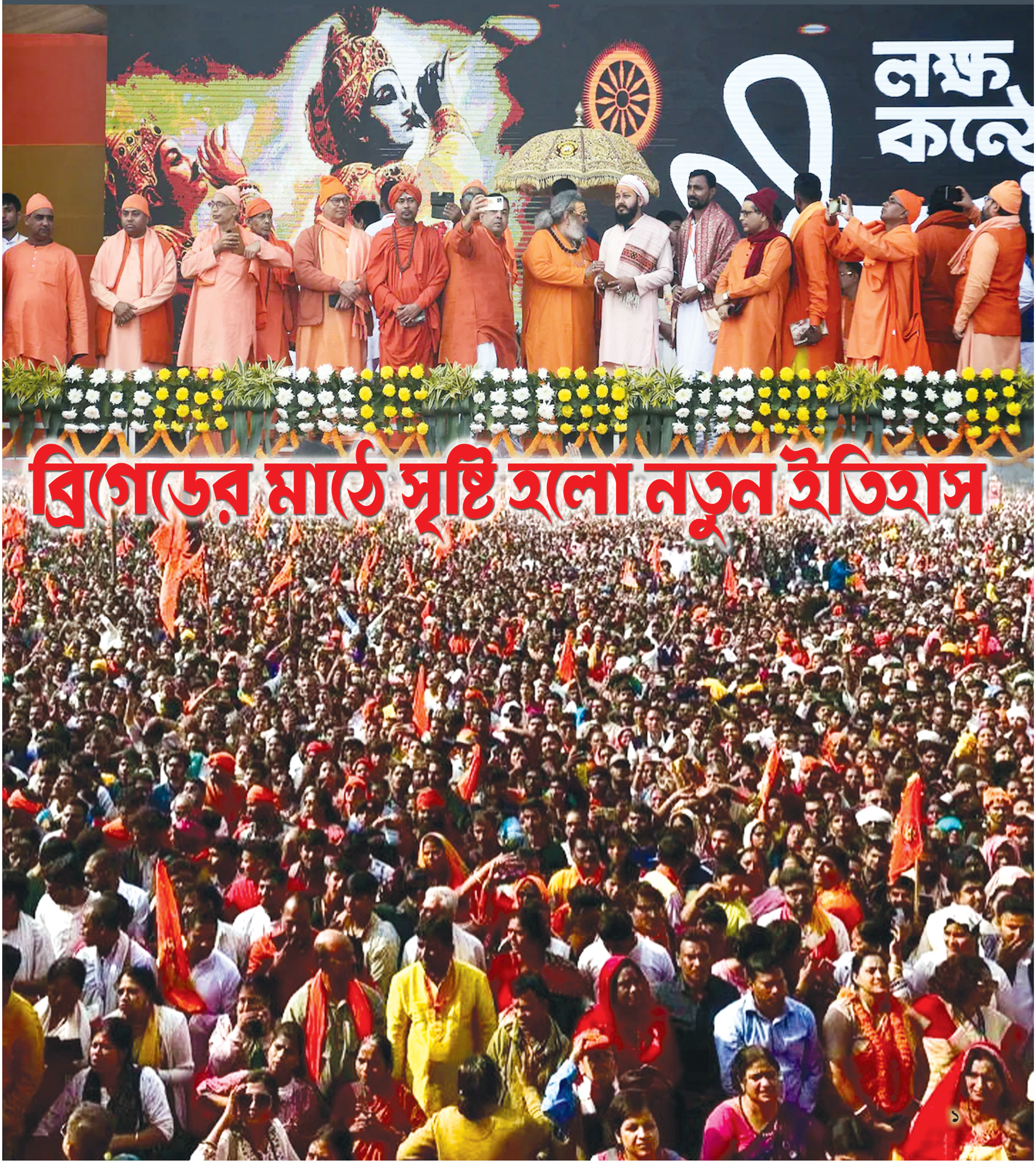

ব্রিগেডের মাঠে সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৫ ডিসেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

তৃণমূলনেত্রীর রাজ্যের চরিত্ররা কাল্পনিক, তাই সত্যি বলে সত্যি কিছু নেই অস্বাভাবিক ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বাবর বনাম গীতা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি ◻ প্রণয় কুমার ◻ ৮

গণতন্ত্র না ডিপ স্টেট? এসআইআর-এ তৃণমূলের অবস্থানবদল বড়ো কোনো খেলার ইঙ্গিত? ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

হায়দার আলি ও টিপু সুলতান কোনোভাবেই স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন না ◻ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ১৩

বঙ্গের নবজাগরণ : মিথ ও বাস্তবতা

◻ তীর্থ চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৬

বাম-জেহাদিদের তথাকথিত পূর্বপুরুষ তিতুমির

◻ দীপক খাঁ ◻ ১৯

স্ট্রিট স্লোগানেই পথ হারালো মাওবাদ

◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

হারানো পত্রিকা—তিন এক অভিজাত পত্রিকা বিচিত্রা

◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

পবিত্র রণক্ষেত্র বুড়িবালামের তীর ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৪

ব্যতিক্রমী জীবনানন্দ দাশ '১৯৪৬-৪৭' ◻ অচিন্ত্য বিশ্বাস ◻ ৩৫

কংগ্রেস ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন নয়, এটি ব্রিটিশের তৈরি একটি 'সেফটি ভালভ্' ◻ ডাঃ মধুসূদন পাল ◻ ৩৮

এক বিপ্লবীর আত্মকথা ◻ সুব্রত চাকী ◻ ৪৩

ভারত-জাপান মৈত্রী স্থাপনায় অগ্রণী ছিলেন রাসবিহারী বসু

◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৬

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুনর্লিখন হলো সময়ের দাবি ◻ কৌটিল্য ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻অঙ্গনা : ২০ ◻সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ ◻সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

ফ: ১

প্রকাশিত হবে
২২ ডিসেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আবার 'বিতর্ক'

প্রকাশিত হবে
২২ ডিসেম্বর
২০২৫

মধ্য এশিয়া হতে আগত, ভারত আক্রমণকারী বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে মুঘর শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং মুঘল সৈন্যরা অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে। পরবর্তী পর্যায়ে সেই স্থানে তারা একটি ধাঁচা নির্মাণ করে। সেই কলঙ্কিত ধাঁচা অপসারণের লক্ষ্যে বহু শতাব্দী ব্যাপী সংগ্রামের পর ২০২৪ সালে অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দির পুনর্নির্মাণে সক্ষম হয়েছে ভারতবাসী। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের পরোক্ষ মদতে রাজ্য জুড়ে সক্রিয় জেহাদি শক্তি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় আক্রমণকারী বাবরের নামাঙ্কিত বাবরি মসজিদ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। ২০২৬ সালের ভোট বৈতরণী পার হওয়ার উদ্দেশ্যে আড়াল থেকে তাতে কেউ মদত দিচ্ছেন কি?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তোষণনীতির অবসান প্রয়োজন

ইংরাজি ডিসেম্বর মাসটি নানাবিধ কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বীর বিপ্লবীর জন্ম ও আত্মবলিদানের মাস এই ডিসেম্বর। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ তথা দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সংগঠিত রূপ তাহা মে মাসে এই বঙ্গভূমি হইতে শুরু হইলেও তাহার প্রভাব ও প্রক্রিয়া এই ডিসেম্বর মাসেই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অগ্নিযুগের অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর জন্ম এই ডিসেম্বর মাসেই। বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল ও আসফাকউল্লার বলিদানও এই মাসেই। ১৮৭৯ সালের ৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। স্বাধীনতাযুদ্ধের বীর সেনানী দীনেশ গুপ্ত ও গোপীনাথ সাহার জন্ম মাসও এই ডিসেম্বর। ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্য বিপ্লবীদের সংগ্রাম ও বলিদান ভারত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অহংকারে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং তাঁর সহকর্মী বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯১২ সালের ন্যায়ই ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বঙ্গের তিন অকুতোভয় বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভরকেন্দ্র কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিঙে আক্রমণ হানিয়া ভারতে ইংরাজ শাসকের বুকে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইতিহাস এই তিন বীর যোদ্ধার সশস্ত্র সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ঘটনাকে স্মরণে রাখিয়াছে 'অলিন্দযুদ্ধ' নামে। ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর— আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। একদা ভারতবর্ষের অভিন্ন অঙ্গ পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের কবল হইতে মুক্তির মাস এই ডিসেম্বর। এই মাসেই স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে 'বাংলাদেশ'। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, যাহা ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারতে এই দিনটি 'বিজয় দিবস' রূপে পালিত হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গের মানুষদের পাকিস্তানি বাহিনীর নিপীড়ন ও অত্যাচার হইতে মুক্তি প্রদান করিতে ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল ভারত। সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রচেষ্টা, পরাক্রম ও ভূমিকাকে সম্মান জানাইতে ৪ ডিসেম্বর দিনটি ভারতীয় নৌসেনা দিবস রূপে পালিত হইয়া থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বহু বিপ্লবীর বলিদান, দেশের স্বাধীনতা এবং দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবার ক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বলিদানকে স্মরণ রাখিয়া ডিসেম্বর মাসকে আত্মত্যাগের মাস হিসাবে গণ্য করা যাইতেই পারে। অন্যান্য মাসে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা আত্মবলিদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নহে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বৎসর বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী দার্শনিক অনিলচন্দ্র রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, বৈদেশিক ভাবধারায় জারিত সেকু-মাকু ঐতিহাসিকগণ যাহারা বহিরাগত আক্রমণকারী অথবা বহিরাগত বংশোদ্ভূত, যাহারা দেশের স্বাধীনতা, সম্মান, নারীজাতির লাঞ্ছনা করিয়াছে, দেবালয় চূর্ণ করিয়াছে, এই দেশকে যাহারা মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহাদের দেশের হুতাত্মা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমপর্যায় ভুক্ত করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। ইতিহাসের কুখ্যাত খিলাফত আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা দান করিয়াছে কংগ্রেসের নেহরু প্রমুখ। ভারত আক্রমণকারী তুর্কি-পাঠান-মুঘলদের মহান শাসকের আখ্যা প্রদান করিয়াছে। জেহাদি হায়দার আলি ও টিপু সুলতানকে তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামী বলিয়াছেন। কমিউনিস্টদের কথা আলাদা। তাহারা তো চিরকাল ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধী। তাহারা আদ্যোপান্ত জেহাদি তিতুমিরকে পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিশুপাঠ্য পুস্তকেও তাহাকে স্থান করিয়া দিয়াছে। তাহার জন্মদিন উদ্‌যাপন করিতে রাজ্যের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিতে হাজার টাকা বরাদ্দও করিয়াছে। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে, যে তোষণনীতির কারণে দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, সেই তোষণনীতি অদ্যাবধি চলিতেছে। ইহার অবসান একান্ত প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

স্বভাবো নোপদেশেন শক্যতে কর্তুমন্যথা।

সুতপ্তমপি পানীয়ং পুনর্গচ্ছতি শীততাম্।।

অর্থ ঃ জলকে উত্তম রূপে উত্তপ্ত করলেও কিছু সময় পরে শীতল হয়ে যায়। তেমনই কোনো কোনো ব্যক্তিকে যতই উপদেশ দেওয়া হোক না কেন, সে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।

তৃণমূলনেত্রীর রাজ্যের চরিত্ররা কাল্পনিক, তাই ‘সত্যি’ বলে সত্যি কিছু নেই

অস্বাভাবিক

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিহারে এনডিএ-র বিশাল জয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি-র ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন জেতার দায়িত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮০ শতাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। তাই আগামী বছরের রাজ্য ভোট জেতাটাই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্মানের। পঞ্চাশের দশকে জনসঙ্ঘ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহ্যকে সামনে তুলে ধরে বিজেপি এখানে গড়ে উঠেছে। ২০২৬-এর ভোটে জিতে সেই রাজনৈতিক বৃত্তকে তাদের পূর্ণ করতে হবে।

রাজ্যের একসময়কার লড়াকু ও বর্ণময় রাজনৈতিক চরিত্র--- বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অনেকেই বলেন যে, ‘তিনি’ বলে সত্যি কিছু নেই। ঘরে বাইরে তার ভাবমূর্তি ফিকে থেকে ফিকেতর হয়ে উঠছে। নেহরু পরিবারের চরিত্ররা যেমন কাল্পনিক হয়ে উঠছে। সোনিয়া ও রাহুল দু’জনেই হঠাৎ করে রাজনীতিতে এসে পড়েছিলেন। রাজীব গান্ধীও তাই। তাই তারা হারিয়ে যাচ্ছেন। রাহুল রাজনৈতিক বালক।

বিহারের ভোট তা প্রমাণ করেছে। কংগ্রেসের মতো তৃণমূলনেত্রীর পাশে এখন আর কেউ নেই। হুমায়ুন কবিরের মতো দুধেল গাইরাও তাঁকে বাতিল করছে। এই অস্বাভাবিকতাই তাঁর প্রাপ্য ছিল। তিনি চিরকাল অস্বাভাবিক রাজনীতির ‘দাপুটে রানি’। আর হুমায়ুনদের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উদ্দেশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী ‘গন্দা ধর্ম’ বলার পরেই হুমায়ুনও মুর্শিদাবাদের হিন্দুদের ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দেয়। সেই হুমায়ুন সন্দেহজনক ব্যবহার করে হঠাৎ বলছে তৃণমূলনেত্রীর চেয়ে রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী অনেক ভালো! বিষাক্ত জিভের থেকে বিষাক্ত সাপ অনেক ভালো।

তৃণমূলনেত্রীই রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি সমস্ত ধরনের স্বাভাবিকতাকে এক ঝটকায় সরিয়ে অস্বাভাবিকতার স্তরে নিয়ে যেতে পারেন। রাজ্যের প্রায় অর্ধে ভোটার সে ভুলে আকৃষ্ট হন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর রেউড়ি ভাতার রাজনীতির অস্বাভাবিকতা নিয়ে কেউ ভাবেননি। তৃণমূলনেত্রী হলেন ভোট রাজনীতির রেউড়ি মাতা। বিজেপির কাছে ‘লাভার্থী’ শব্দটির যা অর্থ তৃণমূলনেত্রীর রেউড়ি ভাতার সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে। প্রভাবও আলাদা। বিহারের নির্বাচনে এনডিএ জোট মহিলাদের এককালীন দশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করে যা কিনা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সারা বছরের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রায় সমান। তৃণমূলনেত্রী এ রাজ্যের ভোটারদের ভাতাজীবী বানাতে চান। নিজে ভোট ভিখারি হয়ে প্রত্যেক ভোটারকে ভিখারি হিসেবে ব্যবহার করেন। বিজেপি চায় তারা কর্মজীবী হোন। তাই এককালীন অর্থসাহায্যের মাধ্যমে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দেয়।

তৃণমূলনেত্রী আদি কংগ্রেসের উপজাত। কংগ্রেস একসময় কৃষকদের ৬২ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুব করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই ধরনেরই ফাঁকা আওয়াজ করেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতায় থাকার জন্য রাজকোষ নিঃশেষ করে ভাতার গাড়ি চালিয়ে ভোট কেনেন।

‘অস্বাভাবিকতা’কে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে ২০২৬-এর ভোট জেতার ছক এঁকেছেন তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যের প্রায় ৮২ হাজার বুথের ভিতর ২,২০৮টি বুথ এলাকায় গত পাঁচ বছরে কেউ মারা যাননি বলে নির্বাচন কমিশনে আজগুবি তথ্য জমা পড়েছে। রাজ্যের প্রায় ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫৬ লক্ষের কোনো খবর নেই; ৩০ লক্ষের কাছে নতুন করে নথিপত্র চাওয়া হয়েছে, আর ৪৬ হাজার লোক ভোটার তালিকায় নাম তুলতে রাজি নন। একটি পুলিশ রিপোর্টের দাবি, ‘এসআইআর’ কাঁটায় রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। তৃণমূল যে ভোটের কাজে ব্যবহৃত বিএলও-দের ক্যাডার বানাবে তা অস্বাভাবিক নয়। তৃণমূলের দোসর সিপিএম তাই করত। ২০১১-র পর রাজ্যে সেই ট্র্যাডিশন চলেছে। অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়েই তৃণমূলনেত্রীর রাজনৈতিক উত্থান। ২০১১-তে তার রাজনৈতিক শত্রু রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সিপিএম-কে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী।

পরামর্শদাতা সংস্থার টিপ্পনিতে তৃণমূল নেত্রী খুব সচতুরভাবে তাই মানুষকে বোঝাচ্ছে যে, বিজেপি ২০২৬-এর ভোট জিততে পারবে না। তাদের সেই সাংগঠনিক শক্তি নেই। তাতে রাজ্যের ভোটাররা বিভ্রান্ত হতেই পারেন। ভাবতে পারেন বিজেপি যখন হেরেই যাবে, তখন ভোট নষ্ট করে কী লাভ? বিজেপি ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৬৫ শতাংশ বুথে বিএলএ-২ নিয়োগ করেছে আর তৃণমূল ৭৪ শতাংশ। এবারের টক্কর সেয়ানে সেয়ানে। তাই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি যদি ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন জিততে চায়, তবে তাদের ঝুঁকি নিয়েও অনেকটা ফ্রন্টফুটে খেলতে হবে। আউট হলে ক্ষতি নেই। লড়াকুভাব থেকে যাবে। তবে লাগলে ছক্কা। তারা মানুষকে বোঝাতে পারবে যে, তৃণমূলনেত্রীর রাজ্যে ‘সত্যি’ বলে সত্যি কিছু নেই। সব চরিত্র কাল্পনিক হয়ে গিয়েছে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

বাবর বনাম গীতা

রেড রোডেষু দিদি,

আমি জানি এই সম্বোধনে খুশি হবেন। কারণ, আমি জানি রেড রোড আপনাকে যতটা টানে ততটা আর কিছু নয়। আর ডিসেম্বরের প্রথম রবিবারেই ব্রিগেড ময়দান যেভাবে গীতাপাঠের মহাযজ্ঞ দেখিয়েছে তাতে তো আপনি নিশ্চিত মনকষ্টে ভুগছেন। আমি দিদি সরাসরিই বলছি, সে আপনি রাগ করলেও বলছি, গিয়েছিলাম। ব্রিগেডে গিয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সঙ্গে আপনার এই অনুগত ভাইয়ের কণ্ঠও মিলে গিয়েছিল।

দিদি, যা বুঝলাম তাতে এবার পশ্চিমবঙ্গ কুরুক্ষেত্র। ধর্মযুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর আসলে অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই। পরিস্থিতি ভালো নয় দিদি। পশ্চিমবঙ্গ এখন কুরুক্ষেত্র। ধর্মযুদ্ধে কখনো মিথ্যার জয় হয় না। ব্রিগেডে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে আপনার ভয় পাওয়ার কারণ আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলাকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব 'চিকেন নেক' অর্থাৎ দুর্বলতম জায়গা। গা ঘেঁষে বাংলাদেশ সীমান্ত। গোলমাল পাকানোর জন্য মসজিদ বানানোর এমন জায়গা আর কী হতে পারে! তাই তো বাবরি মসজিদ তৈরির এই ষড়যন্ত্র। যে কোনো জায়গায় মসজিদ হতেই পারে। কিন্তু তার নাম যখন বাবরি হয় তখনই প্রশ্ন ওঠে। ভারতের উপরে আক্রমণকারী বাবরের নামে মসজিদ কেন! সংশোধিত ওয়াকফ আইনকে ঘিরে কয়েক মাস আগেই মজহবি উগ্রতা আর জেহাদি সন্ত্রাস চলেছিল মুর্শিদাবাদে। এখন ওয়াকফ আইন কার্যকর হওয়ায় মুসলমান ভোট হারানোর ভয়ে আপনি সেখানেই বাবরের নাম মসজিদ বানানোর ছক কষেছেন। হুমায়ুন কবীর নামেই, আসলে যে আপনি সেটা সবাই বুঝতে পারছে দিদি। কারণ, আপনি বুঝতে পেরেছেন এবার পশ্চিমবঙ্গে ভোট আসলে ধর্মযুদ্ধ। এক দিকে নানা দুর্নীতিতে পচে যাওয়া তৃণমূল আর অন্য দিকে রাষ্ট্রবাদী শক্তি। এই লড়াই অহিন্দু বনাম হিন্দুর। মনে রাখতে হবে, হিন্দু মানে কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয়, হিন্দু মানে ভারতীয়। ভারতকে যাঁরা মাতা মনে করেন তাঁরাই হিন্দু। এখন তাঁরা মনে করছেন, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কালো দিন ঘোচানোর সময় হয়েছে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভয়ানক। সেখানে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার চলছেই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের আচরণ সব সময়েই ভারতের ক্ষতি করতে চাওয়া। সেই সময়ে মুর্শিদাবাদকে উত্তেজিত করে আসলে পশ্চিমবঙ্গের বিপদ ডেকে আনতে চাইছে জেহাদি শক্তি। আর তাতে প্রশ্রয় দিচ্ছে আপনার দল, পুলিশ ও প্রশাসন। কেন্দ্র বাছা হয়েছে মুর্শিদাবাদকে। যেখান থেকে জেলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের কেটে ভাগরথীতে ভাসানোর হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছিল।

সাধারণ হিসেবে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশের উপরে সংখ্যালঘু মুসলমান ভোট। কিন্তু সেটা আর তৃণমূলের সম্পদ নয়। মুসলমান সমাজের বড়ো অংশ বুঝেছে এই সরকার শুধু ঠকানোর জন্য যাবতীয় তোষণ করে। আসলে মুসলমান সমাজের বড়ো অংশ এখন তৃণমূলের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তাই আপনি জানেন, বাঁচার রাস্তা একটাই। সবার মনে বিজেপি জুজুর ভয় তৈরি করে দাও। সেটা না করতে পারলে মুসলমান ভোট ভাগ হয়ে সরকার থেকে সরিয়ে দেবে। কারণ, মুসলমান সমাজের বড়ো অংশ এটা বুঝতে পেরেছেন যে, তৃণমূল মানে সুখ নয়। আর বিজেপি মানেই অসুখ এটাও নয়। তাঁদের কাছে অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের নজির রয়েছে। এই ভয়েই তৃণমূল যে এখন সব রকম বিদ্বেষমূলক প্ররোচনা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করতে চাইবে সেটাও বুঝেছে মানুষ। এখন হাতিয়ার হুমায়ুন কবির। এর পরে আরও নতুন কিছু কিছু আসবে।

এরই মধ্যে কলকাতার ব্রিগেডে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের ধ্বনি। সেই ধ্বনি কালীঘাট থেকে নবান্ন সর্বত্র পৌঁছেছে। দিদি আপনি নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভক্ত মানুষ আরও বেশি বেশি করে জোট বাঁধছেন। সাধু সন্ত সমাজ এগিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গকে শাপমুক্ত করতে।

গীতার মন্ত্র স্বাধীনতার লড়াইয়ে পাথেয় হয়েছে। গীতার মন্ত্রেই পশ্চিমবঙ্গের কালো দিন শেষ হওয়ার আশা তৈরি হলো কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে। আবার বলছি দিদি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন আসলে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। সেই কুরুক্ষেত্রে অধর্মকে নাশ করে ধর্মের জয় নিশ্চিত করতে চায় পশ্চিমবঙ্গ। □

অতিথি কলম

প্রণয় কুমার

ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি

ভারতের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে পাশ্চাত্যের নকল করে নয় বরং নিজস্ব শক্তির স্বদেশী বুদ্ধি ও ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার উপর নির্ভর করে।

বিভাজনকারী প্রবৃত্তি এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' গঠনের সবচেয়ে বড়ো বাধা। কারণ দেশের অধিকাংশ সমস্যার সৃষ্টি এখান থেকেই। দেশ বিভাজনকারী মানসিকতা রাষ্ট্রীয় একতা বা শক্তিকে দুর্বল করে এবং এই মানসিকতাই ভারতকে তার মূলস্রোত, ধর্মের ব্যাপক ধারণা এবং সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে দেয়নি। তার ফলে দেশের প্রগতিও সঠিকভাবে হয়নি এবং দেশের মৌলিক পরিচয় সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতার পর সবাই আশা করেছিল--- ভারত তার নিজের সংস্কৃতি, পরম্পরা, আদর্শের অনুরূপ শিক্ষা, প্রশাসন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন কীর্তি স্থাপন করবে, কিন্তু দেখা গেল শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, প্রশাসনের চরিত্র বা ঔপনিবেশিক ধাঁচা আগের মতোই থেকে গেছে। তার ফলে শিক্ষা, কলা, সাহিত্য, শাসন, প্রশাসন, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র, বাস্তুশাস্ত্র, গবেষণা, আইন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে আজও বিদেশি চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির গভীর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঔপনিবেশিক তন্ত্র ও মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন না হবে ততদিন বিকশিত ভারতের মজবুত ভিত তৈরি করা সম্ভব নয়।

ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্তি : ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে মেকলে দ্বারা স্থাপিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেই মানসিকতার প্রভাব অনেক গভীরে রয়েছে, যার জন্য তাঁরা যেকোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ২০১৪ সালের পর প্রশাসন, নীতি নিরূপণ ও সামাজিকভাবে ঔপনিবেশিক মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০৩৫ সালের মধ্যে মেকলে শিক্ষা প্রণালী থেকে উৎপন্ন দাসত্ব মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত হবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন হাজার বছরের ভারতীয় জ্ঞান, কলা, সংস্কৃতিকে মেকলে মানসিকতা নষ্ট করে দিয়েছে এবং বিদেশি পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ বলে চালিয়েছে। তিনি স্বদেশী শিক্ষা পদ্ধতিকে পুনঃস্থাপিত করা এবং ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার প্রতি গর্ব করতে জোর দিয়ে বলেছেন যাতে এই মুক্তিই ভারতের বিকাশ ও আত্মনির্ভর হওয়ার মূল চাবিকাঠি হয়। মোটকথা, স্বাধীনতার পরেও ভারতের আর্থিক, শৈক্ষিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি পশ্চিমি সূচকের উপর ভিত্তি করে চলছে এবং ভাষা, পরিচিতি, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রকে দুর্লক্ষ্য করেছে।

জ্ঞান ও যোগ্যতার পরিমাপ না করে ইংরেজি ভাষার দক্ষতাকে মানদণ্ড ধরা হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় যুবকদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি হীনভাব সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমি ভাষার উচ্চারণ ও চালচলন নকল করাও এই মানসিকতার পরিচায়ক। এরকম মানসিকতা ত্যাগ করে ভারতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক মূলবোধকে পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন আছে, তবেই দেশের সমগ্র বিকাশ সম্ভব। ব্রিটিশ, আমেরিকানদের মতো ইংরেজি বলার উপর জোর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধীজী, এপিজে আবদুল কালামের মতো মহান ভারতীয় ব্যক্তিদের জ্ঞান ও গরিমাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। শিষ্টাচার ও 'ড্রেসিং সেন্স'-এর নামে ভারতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পূর্বপুরুষদের থেকে আলাদা করা হয়েছে। মেকলে শিক্ষার প্রভাবে নিজস্ব কৌশল ও প্রতিভাকে ছোটো করে পাশ্চাত্য রীতিকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী পশ্চিমীকরণকে আধুনিকতা বলে মনে করেন এবং ভারতীয় পরম্পরাকে হীন দৃষ্টিতে দেখেন। পাশ্চাত্যের যা কিছু ভালো এবং ভারতীয় যা কিছু সবই মন্দ, এমনোভাবও দাসত্বের পরিচয় বহন করে। বৈশ্বীকরণ ও উপভোক্তাবাদও এই মানসিকতারই নামান্তর।

এটা দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন ভারতে ভারতীয় ভাবনার উন্মেষ, কলাকৌশল ও উৎকর্ষতাকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে প্রায় দূর করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যোগ, আয়ুর্বেদ ও বাস্তুশাস্ত্রের মতো পরম্পরাগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলির জাগরণ ঘটেছে এবং পশ্চিমি দেশ এগুলিকে স্বীকার করছে। এছাড়া, কাল গণনা, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ, তবু এগুলিকে পূজাপার্বণ বা উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। নগর ব্যবস্থা, বাস্তুতন্ত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে সৌন্দর্য, রং, রস, রূপ ইত্যাদির ব্যাপকতা ও বিবিধতা পশ্চিমের থেকে অনেক বেশি বিকশিত ও সমৃদ্ধ। পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধানুকরণ করে তথাকথিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা আমাদের সমাজের সরলতা ও একাত্মতাকে প্রাধান্য দেননি, যদিও ভারত সারা দুনিয়াকে

বর্ণবৈষম্যের চোখে না দেখে সবাইকে সমান সম্মান দেখিয়েছে।

সকলকে নিয়ে চলার পরম্পরা ঃ আমাদের সাংস্কৃতিক নায়ক শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ— তাঁরা যদিও শ্যামবর্ণের ছিলেন কিন্তু সৌন্দর্য ও আচরণে আদর্শ পুরুষ। দ্রৌপদী ওই সময়ের সুন্দরী নারীদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁর অন্য নাম ছিল কৃষ্ণা। সাদা চামড়াকে প্রাধান্য দেওয়া ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। আমাদের আহার, বিহার ও জীবনচর্যা প্রকৃতিবান্ধব ও পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল। তবুও আমরা পশ্চিমি মানসিকতাকে অতিক্রম করতে পারছি না। মধ্যযুগীয় সংঘর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব বলে চালানো এবং আক্রমণকারী চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা একই মানসিকতার পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ, আলাউদ্দিন খিলজি বা আকবরের ভূমিকায় সিনেমাতে রণবীর সিংহ ও ঋত্বিক রোশনের মতো উঁচু মাপের সুন্দর চেহারার অভিনেতারা অভিনয় করেছেন। রণবীর সিংহ 'পদ্মাবত' নিনেমাতে আলাউদ্দিন খিলজির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যেখানে আলাউদ্দিনের বাস্তবিক রূপ ফুটে ওঠেনি। এই মানসিকতায় ভারতীয়দের বোঝানো হয়েছে মুঘল-আফগানদের আক্রমণ ইসলামিক নয় এবং ব্রিটিশদের আক্রমণও খ্রিস্টানদের নয়। ফলে স্বাধীনোত্তর যুগে শিক্ষা ও বৌদ্ধিক বিমর্শের ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং নিজেদের ভাষা, ভোজন, ভজন ইত্যাদিকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। এখানে যুবকদের পড়ানো হচ্ছে পশ্চিমি সংস্কৃতি বেশি বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল, যেখানে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলি বিনা ব্রিটিশ পদ্ধতি ছাড়াই উন্নতি করেছে। আজও অনেক বুদ্ধিজীবী জোর গলায় বলে থাকেন—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশরা ভারতীয়দের 'সভ্য ও সুসংস্কৃত' করেছে— এটাও দাসত্বের পরিচয়। এটা সর্বৈব মিথ্যা যে ইংরেজ ছাড়া ভারতের বিকাশ সম্ভব ছিল না। সত্য এটাই যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, শিল্প, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিবিধতা ইংরেজ আসার অনেক আগে থেকেই বিকশিত ও সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের রাজনৈতিক একাত্মতা, রাষ্ট্রীয়তা প্রভৃতি ইংরেজদের কারণে তৈরি হয়েছে, এসব মিথ্যা। আর্যরা বাইরে থেকে এসেছে, ধর্ম ও রিলিজিয়ন একই, এসব মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে। বরং সঠিক শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করার জন্য ইংরেজদের গবেষণাপত্র ও সমীক্ষা রিপোর্ট অধ্যয়ন করা উচিত— যার থেকে ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যাবে। এইসব মিথ্যা প্রচার মার্কস ও মেকলের মতো লোকেদের দ্বারা হয়েছে। ভারতের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষার অবস্থা ইংরেজরা আসার আগেই বহুগুণ উন্নত ছিল।

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে ছোটো দেখানো : ইংরেজ আসার অনেক আগেই ভারত জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। ইংরেজদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৮-১৯ শতাব্দীতেই ভারতে ১০০০-এর বেশি লৌহ শিল্প ছিল যেখানে ইংল্যান্ডের চেয়ে উচ্চমানের ইস্পাত তৈরি হতো। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতের শিক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা, কৃষি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষমতা অনেক উন্নত ছিল। এসব তথ্য ধর্মপালের গ্রন্থসমূহের মধ্যেও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ধর্মপাল 'The beautiful tree—indigenous Indian education in the 18th century' এবং 'Indian science and Technology in the 18th century' এই দুই গ্রন্থে ইংরেজদের দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই সত্যকে স্পষ্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইংরেজদের শিল্পবিপ্লবের অহংকার ভারতের প্রাচীন প্রযুক্তিবিদ্যার সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। কৃষি, সেচব্যবস্থা, সুতিবস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত প্রাচীন ও উন্নত ছিল। খাদ্যশস্য, ডাল, তৈলবীজ, ফল, ফুল, শাকসবজি ও দুধ উৎপাদনে ভারতের স্থিতি ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতের কৃষি উৎপাদন ইংল্যান্ডের চেয়ে প্রায় ২/৩ গুণ ছিল। ভারতীয় কৃষকরা নিজের জমি নিজেরাই চাষ করত। তথাকথিত আধুনিক উদার ইংল্যান্ডে কৃষিকাজ করানো হতো দাস ও শ্রমিকদের দ্বারা। ভারতের গ্রাম থেকে শহরে ছোটো বড়ো জলাশয়গুলি সারা বছর পরিপূর্ণ থাকতো। যা থেকে জলসংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও মহীশূরের পাশাপাশি অঞ্চলেই এক লক্ষের বেশি জলাশয় ছিল। ১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ত এতো সুতিবস্ত্র রপ্তানি হতো যে, ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শল্যচিকিৎসায় গ্রামীণ বৈদ্যরা ইউরোপের চিকিৎসকদের থেকেও উন্নত ছিল এবং ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা গুটি বসন্তের টিকা পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন। ইংরেজ বিদ্বানরা ঔপনিবেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে তাদের সমীক্ষায় ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শিক্ষা পরম্পরার প্রশংসা করেছেন।

বিশ্বের শিক্ষাপ্রণালী ভারতেরই দান : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারী উইলিয়াম অ্যাডাম ১৯৩০-৩৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ ও বিহারে শিক্ষাব্যবস্থার উপর সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেই তথ্য অনুযায়ী ওই দুই প্রদেশে এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে ছোটোবড়ো পাঠশালা ছিল না। এই ক্ষেত্রের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল যেখানে গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে ৪০০ জন ছাত্র ছিল। তখন ওই দুই রাজ্যের মিলিত জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি। এই সমস্ত স্কুল বিভিন্ন মন্দিরে, খোলা অঙ্গনে, বটগাছের ছায়ায় বা কোনো শিক্ষকের বাড়িতে সঞ্চালিত হতো। অ্যাডামের তথ্য অনুযায়ী এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সামাজিক ও আর্থিক ভেদভাব ঘুচিয়ে সমাজের সব শ্রেণীর গরিব ছেলেদেরও শিক্ষার সমান ব্যবস্থা থাকতো। তারও আগে মাদ্রাজের গর্ভনর জেনারেল থমাস মুনরো ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে 'The Minutes on Native Education in the Madras Presidency, 1822 and 1826' শীর্ষক রিপোর্টে লিখেছেন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সব গ্রামে পাঠশালা রয়েছে। এই রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে মুনরো লিখেছেন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে শিক্ষার স্তর আমাদের দেশের (ইংল্যান্ড) তুলনায় কম হলেও সমগ্র ইউরোপের তুলনায় অনেক উন্নত। তথ্য অনুসারে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১১,৫৭৫ বিদ্যালয় ও ১,০৯৪ মহাবিদ্যালয়

ছিল যেখানে যথাক্রমে ১,৫৭,১৯৫ জন ও ১৫,৪৩১ জন ছাত্র ছিল। অনেক ব্রিটিশ আধিকারি ও মিশনারিরা ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির সুনাম করেছেন, এই সমস্ত রিপোর্টে ঔপনিবেশিক মানসিকতাবে ভুল প্রমাণ করে ভারতের প্রাচীন উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবের কথা উঠে এসেছে।

একই সময়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গভর্নর (১৮১৯-২৭) মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টো ১৮২৪ সালের ১০ মার্চ দাক্ষিণাত্যের কমিশনার এবং গুজরাট ও কোঁকনের কালেক্টরদের শিক্ষার ব্যাপক সমীক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। Elfinston Committee রিপোর্ট দিয়েছে এক্ষেত্রের প্রায় সব গ্রামে বিদ্যালয় রয়েছে। এমনকী বড়ো গ্রাম হলে একের বেশিও আছে। একইভাবে ব্রিটিশ অধিকারী Dr. G.W. Litnor-এর তথ্য অনুসারে, পঞ্জাব প্রদেশে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার বিদ্যার্থী পড়তো, যে সংখ্যা ঔপনিবেশিক নীতির কারণে কমে গিয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ১ লক্ষ ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের আগে ভারতের বিকেন্দ্রিত, সমৃদ্ধ ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। Litnor কিছু সমীক্ষার ভিত্তিতে তাঁর পুস্তক— 'History of indigenous education in Punjab, 1882-এ লিখেছেন— 'ভারতে খুব ভালো বিকেন্দ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে।' প্রায় সব গ্রামে পাঠশালা আছে যা ওই গ্রামের লোকেরাই চালায়। পাঠশালার নামে যে জমি রয়েছে, সেই জমি গ্রামের কৃষকরা চাষ করেন। সেই আয় থেকে পাঠশালার খরচ চলে। এর মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ের মান ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য, শিক্ষকদের ভালো বেতন দেওয়া হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর এক অধিকারী Alexander Walker (১৭৬৪-১৮৩১) মালাবার অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার অধ্যয়ন করেন এবং লিখেন— মালাবারের শিক্ষা ব্রাহ্মণদের থেকে শুরু হয়েছে এবং এই পদ্ধতি ভারত থেকে ইউরোপে পৌঁছেছে। এরই ভিত্তিতে সারা দুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। সব পরিবারেই প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল শিক্ষা। অনেক মহিলাও সাক্ষর ছিলেন। ছাত্ররা সরল পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করতো। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা নীচু ক্লাসের ছাত্রদের শিক্ষা দান করতো। মিশনারিরাও স্বীকার করেছে যে, ব্রিটিশরা ভারত থেকেই শিক্ষা পদ্ধতি ইংল্যান্ডে নিয়ে গেছে। মার্কস-মেকলের অনুসারীরা অপপ্রচার করেছে যে ইংরেজদের আসার আগে ভারতে কেবল ব্রাহ্মণ এবং কিছু বিশেষ জাতির মধ্যেই শিক্ষার প্রচলন ছিল।

আগামী দশ বছরের মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে দূর করার যে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী করেছেন, তাতে আবার ওই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কিন্তু ইংরেজ অধিকারীদের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ওই সময়ের গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার ৮০ শতাংশ ছাত্র তথাকথিত পিছিয়ে পড়া, দলিত, বঞ্চিত পরিবারেরই ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মাত্র ১৩ শতাংশ ছাত্র ব্রাহ্মণ ছিল এবং ৭৬.১৯ শতাংশ নিম্নবর্গের ছিল। প্রায় একই অবস্থা কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও ওড়িশার কিছু জেলাতে। কেবল তেলেগুভাষী এলাকায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪৬ শতাংশ এবং অন্য বর্ণের সংখ্যা ৪১ শতাংশ। উলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টেও ছাত্র- শিক্ষকের অনুপাত জাতপাতের পরিসংখ্যানে একইরকম। প্রথমে বলা হতো বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণেরাই করতো। অ্যাডাম তো শিক্ষায় জাতপাতের বিবরণও দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া বঙ্গ ও পঞ্জাবের রিপোর্ট সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করেছে। সব জাতির ছেলেরাই ছাত্র বা অধ্যাপক হতে পারে। Litnor-এর তথ্য অনুসারে পঞ্জাবের বিদ্যালয়ে সব জাতি/বর্ণের ছেলেরা ভেদভাবমুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করত। সেসময় পাঁচ রকমের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল--- গুরুমুখী, মক্তব-মাদ্রাসা ও কোরান স্কুল, নিম্নপাঠশালা , পাঠশালা এবং পন্থনিরপেক্ষ হিন্দুস্কুল। এরমধ্যে ফারসি, দেশীয় ভাষা, ইংরেজি বিদ্যালয় এবং শিখ, মুসলমান ও হিন্দু বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ও ছিল। ইংরেজ অধিকারীদের দ্বারা তৈরি রিপোর্টে প্রমাণ করে যে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা সমৃদ্ধ ও সর্বসমাবেশক ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক মানসিকতার জন্য আমাদের পিছিয়ে পড়া ও অশিক্ষিত বলা হচ্ছে— যা বাস্তব অর্থে বিপরীত।

ভারতের পারম্পরিক শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থাকে জানতে হলে ঔপনিবেশিক দৃষ্টি এবং মার্কস- মেকলে প্রভাবিত মানসিকতাকে পরিত্যাগ করতে হবে, যারা আমাদের স্ব'-বোধ ও অতীত স্মৃতিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান আগামী ২০৩৫ পর্যন্ত উপনিবেশিক মানসিকতার মুক্তি এবং দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে ভারতকে নিজের জায়গায় পুনঃস্থাপন করার সংকল্প নিতে হবে। ভারতের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে পাশ্চাত্যের নকল করে নয় বরং নিজস্ব শক্তির স্বদেশী বুদ্ধি ও ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার উপর নির্ভর করে। তাই আমাদের ঐতিহাসিক সত্যকে নির্ভয়ে সামনে আনতে হবে, ঔপনিবেশিক অপপ্রচারকে পরাস্ত করতে হবে এবং এমন শিক্ষাপদ্ধতি বিকশিত করতে হবে যার দ্বারা বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সাকার হবে।

(লেখক একজন প্রবীণ প্রাবন্ধিক)

শোক সংবাদ

মালদা জেলার পূর্বতন বরেন্দ্র মহকুমা পরে জেলা সঙ্ঘচালক সুধীর কুমার সাহা গত ২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। তিনি পুরাতন মালদহের কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার কালেশ্বর খণ্ড বৌদ্ধিক প্রমুখ কৌশিক মণ্ডলের ঠাকুরদা রামচরণ মণ্ডল গত ৩০ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

গণতন্ত্র না ডিপ স্টেট? এসআইআর-এ তৃণমূলের অবস্থানবদল বড়ো কোনো খেলার ইঙ্গিত?

সাধন কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি আজ এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজ— এসআইআর পরিণত হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক ঝড়ের কেন্দ্রে। ভোটার তালিকা সংশোধন কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়; এটি সংবিধানের অধীনে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন প্রক্রিয়া। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়াটিই হয়ে উঠেছে শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ, যার সামনে প্রশ্ন উঠছে-– রাজ্যের সাংবিধানিক কাঠামো কি রাজনৈতিক পেশিশক্তির নীচে চূর্ণ হচ্ছে?

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় রূপান্তর : এসআইআর-বিরোধিতা থেকে হুমকির রাজনীতির শুরুতে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল সরাসরি— 'আমি বেঁচে থাকতে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে দেব না।' এরপর সময় পালটালো। প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। এবং হঠাৎ করে তাঁর সুরও পালটে গেল।

এখন তাঁর বক্তব্য হলো, 'একজন বৈধ ভোটারের নাম কাটলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।' '২০২৯-এ বিজেপি দেশের শাসন ক্ষমতা হারাবে।' 'বাংলা দখল করতে এলে গুজরাট হারাবে।' 'খেলা হবে'— এই সব ভাষাও আবার সামনে এল। এই পরিবর্তন শুধু ভাষার বদল নয়— এটি রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রশ্ন যে, এসআইআর নিয়ে তিনি প্রথম দিন রাস্তায় নেমেছিলেন, আজ কেন তার বিরোধিতা নেই? এসআইআর কি এখন তাঁর সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে? যদি তিনি মনে করেন এসআইআর মানুষের ক্ষতি করবে, তাহলে তিনি বিজেপিকে নয়, নির্বাচন কমিশনকেই আক্রমণ করতেন। কিন্তু তিনি এখন করছেন উলটোটা। এখন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে--- এসআইআর নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, এখন তিনি রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন খেলা খেলছেন।

অভিষেক ব্যানার্জির মন্তব্য : সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা অভিষেক ব্যানার্জি সম্প্রতি অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন— 'মাটি খুঁড়ে হলেও নির্বাচন কমিশনারকে বের করব।'

এই বক্তব্য শুধু অশালীন নয় বরং সরাসরি ভারতের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান— নির্বাচন কমিশনের প্রতি হুমকি।

সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের নির্বাচন কমিশনকে এভাবে লক্ষ্যবস্তু করা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাসরি হুমকি দেওয়া, প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা— এসব গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর ওপর রাজনৈতিক হামলা। অনেকেই বলছেন, এটি কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, এটি সাংবিধানিক শৃঙ্খলার ওপর সরাসরি আঘাত।

> **পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, রাজ্যের গণতন্ত্র, রাজ্যের ভবিষ্যৎ, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা— এই চারটি প্রশ্ন আজ রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।**

সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করার প্রবণতা : ডিপ স্টেটের প্রসঙ্গে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উঠে আসছে--- বহু পর্যবেক্ষক প্রশ্ন তুলছেন, রাজ্যের সরকার কি সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর দাঁড়ানোর বদলে 'ডিপ স্টেট'-এর কোনো খেলায় অংশ নিচ্ছে? কারণ, নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ, সরকারি কর্মচারীদের হুমকি, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার, তালিকা সংশোধনের ক্ষমতা দলীয় ক্যাডারের হাতে দেওয়ার অভিযোগ, বিচার ব্যবস্থাকে আক্রমণ, কুরুচিপূর্ণ ভাষায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ— এসব আচরণ গণতান্ত্রিক দেশের নিয়মের পরিপন্থী।

ভারতের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে এমন আচরণ যদি বার বার দেখা যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জন্মাবে--- শাসনযন্ত্রের ওপর বিদেশি ডিপ স্টেট গ্রুপের অবৈধ প্রভাব বাড়ছে কি? নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও নির্বাচনী স্বাধীনতা কি ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে? এই প্রশ্নগুলো নতুন নয়, বরং সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এই প্রশ্নকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বাস্তবতা হলো, এসআইআর-এর ছদ্মবেশে নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনীতি, এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রকে আড়াল করার জন্যই কি মমতা ও তার দলের কর্মীদের আস্ফালন?

বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—

- **বিএলও-দের জায়গায় পার্টটাইম কর্মী**

ফ ঃ ২

বা দলীয় লোক।

এটি এসআইআর-কে নিরপেক্ষ রাখার সমস্ত নিশ্চয়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির বুথ লেভেল এজেন্টদের জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এলাকাছাড়া করা হচ্ছে। এইসব জায়গায় বিএলও-রা তৃণমূলের ব্যবস্থাপনায় নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে। এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর। সক্রিয় তৃণমূল কর্মীরাও বিএলও-র কাজ করছেন এই দৃষ্টান্ত রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি এই সমস্ত কাজ তাঁর দলকে দিয়ে করিয়েছেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনার সঙ্গে। এসআইআর-বিরোধিতার নামে চিৎকার করছেন সেটা আসলে তাদের এই অন্তর্ঘাতকে লুকিয়ে রাখার জন্য।

• মুসলমানপ্রধান এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে নতুন নাম ওঠার অভিযোগ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমান এলাকায় মুসলমানদেরই বিএলও নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ওখানে কী হচ্ছে তা কিন্তু বলা মুশকিল। মিডিয়ায় এমন দৃষ্টান্ত দেখা গেছে যে একজন ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে প্রায় দুই ডজনের মতো ভোটার এসআইআর-এ তাদের নাম তুলেছে। মুসলমানদের বাবা-ছেলের নামের যা ধরন তাতে এই কাজটি খুবই সহজ। এটা কী করে রোধ করা যাবে, এই নিয়ে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কোনো নির্দেশিকা নেই। মুসলমান এলাকায় এই ধরনের ভুয়ো ভোটারকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সংগঠন বিরোধীদের নেই। যার ফলে এখানে তৃণমূল কংগ্রেস যা করবে সেটাই চূড়ান্ত।

• সীমান্তবর্তী এলাকায় ডুপ্লিকেট ভোটার।

প্রতিদিন মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশি মুসলমানরা বিভিন্ন বস্তি খালি করে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ অনুপ্রবেশকারী রয়েছে তাতে এই চলে যাওয়ার সংখ্যাটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। সেজন্য সীমান্ত এলাকায় ডুপ্লিকেট ভোটার, মৃত ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকা খুবই স্বাভাবিক।

• বিরোধী ভোটারদের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ।

এটিও দীর্ঘদিনের সমস্যা, যা আজ আরও তীব্র। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে, পশ্চিমবঙ্গ এসআইআর কি সত্যিই নিরপেক্ষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নাকি রাজনৈতিক কৌশল পরিচালনার সুযোগ? মমতা ব্যানার্জির যা রাজনৈতিক কৌশল তাতে খসড়া তালিকায় বহু হিন্দু ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যাদের নাম বাদ যাবে তাদের হয়ে মমতা ব্যানার্জি মাঠে নেমে লড়াই শুরু করার নাটক করবেন। যাতে হিন্দু ভোটারদের সমর্থন বিজেপির পাল থেকে কেড়ে নিয়ে তৃণমূলের ভোট বাক্সে প্রতিফলিত হয়। যা পরিবেশ পরিস্থিতি তাতে এরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনাই প্রবল।

নির্বাচন কশিনের অসহায়তা : রাজ্য সরকারি কর্মচারীর ওপর নির্ভরশীলতা। কারণ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মীবাহিনী নেই।

তারা কাজ করান সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীদের দিয়ে, কিন্তু এই কর্মচারীরা সবাই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। যদি রাজনৈতিক চাপ, হুমকি, ভয়, বদলির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাঁদের নিরপেক্ষ থাকা কঠিন।

তৃণমূলের জমানায় এই বাস্তবতা নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সরকারি কর্মীদের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে।

বাংলাদেশি শরণার্থী ও মতুয়া ফ্যাক্টর : বিভ্রান্তি, রাজনৈতিক দোলাচল ও অনিশ্চয়তা।

বাংলাদেশি শরণার্থী ও মতুয়া সমাজের মানুষদের বিভিন্ন নথিপত্র নেই, নাগরিকত্ব নিয়ে তাঁদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি, এসআইআর-এ বাদ পড়ার সম্ভাবনা।

এই তিনটির মিশ্রণে গভীর অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এখানে উভয় পক্ষই ভিন্ন সুরে কথা বলছে। তৃণমূল তাঁদের মনে নাগরিকত্বের বিষয়ে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং বলছে— তাদের নাগরিকত্ব রক্ষা করবে। বাস্তব পরিস্থিতি হলো, দেশের আইন অনুযায়ী— সিএএ-তে আবেদন না করলে সমস্যা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে ঘোলা জলে মাছ ধরার সুযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত দল হাতছাড়া করবে না।

সামনে যে সংকট আসছে :

ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ হলে— নাম বাদ পড়বে, ভুল নাম-ঠিকানা উঠবে, নতুন নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, বিরোধী দলের আন্দোলন বাড়বে, শাসক দলের প্রতিক্রিয়া আরও আগ্রাসী হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন আজ শুধু প্রশাসনিক কাজ নয়, এটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য এক পরীক্ষা।

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের প্রশ্ন, আজ এরাজ্যে যে রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে— হুমকি, আক্রমণ, অবমাননা— তা শুধু রাজনীতির ভাষা নয়, এটি গণতন্ত্রের পক্ষে বড়ো উদ্বেগের বার্তা।

• নির্বাচন কমিশনকে হুমকি : এসআইআর-এর ওপর রাজনৈতিক পেশিশক্তি, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা, ডিপ স্টেটের প্রশ্ন।

• ভোটার তালিকাকে রাজনৈতিক অস্ত্রে রূপান্তর : পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামীকরণের প্রশ্ন। গ্রেটার বাংলাদেশ হয়ে গিয়ে ইসলামিক ষড়যন্ত্রের আঁতুড় ঘর হয়ে উঠার প্রশ্ন। এসব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ।

যে রাজ্যে মানুষ নিরাপদে ভোট দিতে পারে না, সেখানে এসআইআর-এর মতো সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বিপথে চালিত করা সত্যিই বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, রাজ্যের গণতন্ত্র, রাজ্যের ভবিষ্যৎ, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা— এই চারটি প্রশ্ন আজ রাজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

হায়দার আলি ও টিপু সুলতান কোনোভাবেই স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন না

হায়দার আলি

টিপু সুলতান

এঁরা নিজেরাও ছিলেন বিদেশি বংশোসম্ভূত, ভাগ্যান্বেষী শাসক। টিপু সুলতান প্রজাদের কাছে পরিচিত ছিলেন অত্যাচারী এবং মহীশূরের রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই। সুতরাং এঁরা আর যাইহোক, স্বাধীনতাযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হতে পারেন না।

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

গত ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর কর্ণাটকের কংগ্রেসি সরকার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার নভেম্বর মাসে অষ্টাদশ শতকের মহীশূরের শাসক টিপু সুলতানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'টিপু জয়ন্তী' পালন করে এসেছে। ২০১৫ সালে এই উৎসব পালনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে চরণ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। টিপুর এই জন্মশতবার্ষিকী পালন কর্ণাটকের অধিকাংশ মানুষকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। ওই রাজ্যের কুর্গ অঞ্চলের মাডিকেরিতে টিপুর জন্ম শতবার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত আন্দোলনকারীদের উপরে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের গুলিচালনার ফলে কুট্টাপ্পা নামে এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এর ফলে ওই বিক্ষোভ চিত্রদুর্গ, ম্যাঙ্গালোর, টুমকুর ইত্যাদি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের বক্তব্য, টিপু সুলতান অত্যন্ত গোঁড়া ও অত্যাচারী মধ্যযুগীয় শাসক ছিলেন।

অন্যদিকে, ওই রাজ্যের খ্রিস্টানদের বক্তব্য হলো, টিপু ছিলেন অসহিষ্ণু, অত্যাচারী এবং বহু চার্চ ধ্বংসকারী। সে শুধু খ্রিস্টানদের দলবদ্ধভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু ম্যাঙ্গালোর ও কেরালা উপকূলের বহু গির্জা ধ্বংস করেছিল। আবার কোডাভা ও ভোক্কালিগা— এই দুই হিন্দু সম্প্রদায় ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। কারণ টিপু সুলতান এই দুই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্বিচারে হত্যাই করেননি, ধ্বংস করেছেন হিন্দু মন্দিররাজিও। ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের নাম 'ভোক্কালিগা' সম্প্রদায়ভুক্ত রাজা কেম্পেগৌড়ার নামে। এই রাজা কেম্পেগৌড়াই ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যাঙ্গালুরু শহরের পত্তন করেন। ব্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের নাম পালটে টিপুর নামে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কন্নড় নাট্যকার ও অভিনেতা গিরীশ কারনাড। যদিও প্রতিবাদের ফলে সে প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। কংগ্রেস নেতা, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া পর্যন্ত টিপু সুলতানকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবেও চিত্রিত করেছেন যেমন এই পশ্চিমবঙ্গে অনেকেই সিরাজ-উদ-দৌল্লাকেও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করে থাকেন।

টিপু সুলতান বা সিরাজউদ্দৌলা উভয়েই নিজেদের গদি বাঁচাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরাও ছিল ইংরেজদের মতোই বহিরাগতদের বংশধর। শুধু তাই নয়, দু'জনেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন বা বিদেশি শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এদেশ আক্রমণ করতে। সিরাজ ফরাসিদের সাহায্য নিয়েছিলেন আর টিপু সুলতান আফগানিস্তানের দুররানি সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসক জামান শাহ্‌কে চিঠি লিখে জানান যে তিনি 'বাদশাহ' হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছেন এবং তিনি ভারতবর্ষে এক ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই লক্ষ্যপূর্তির জন্য তিনি জামান শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্যও নিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীই বটে! কংগ্রেসি ও বামপন্থী ঐতিহাসিকগণ কী বলেন?

আসলে টিপু সুলতান ছিলেন এক উগ্র, অসহিষ্ণু, অত্যাচারী শাসক। সমকালীন ভারতবর্ষে এমন উগ্র, জেহাদি শাসকের দৃষ্টান্ত মেলে কদাচিৎ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের ইসলামে ধর্মান্তর, তাঁদের মন্দিরাদি ধ্বংস করে এক মজহবি রাজ্যস্থাপনের উদগ্র বাসনাই তাঁর পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

বৃহত্তর মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্য পূর্তির উদ্দেশে কোডাগু (কুর্গ) আক্রমণ করে সেটি দখল করেন টিপু। কুর্গের বাসিন্দাদের কাছে ঘোষণা করেন, 'আমি তোমাদের সবাইকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করব।' হাজার হাজার 'কোডাভা' সম্প্রদায়ের মানুষকে বন্দি করে তাঁদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে শেষে পুরুষ, মহিলা ও শিশু-সহ সবাইকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় জোর করে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মার্ক উইলকস-এর মতে, ধর্মান্তরিত কোডাভাদের সংখ্যা সত্তর হাজার।

ঐতিহাসিক লুইস রাইসের মতে এই সংখ্যাটি হবে ৮৫ হাজার। ঐতিহাসিক হুসেন আলি খান কিরমানি তাঁর 'হিস্ট্রি অব হায়দার নায়েক' গ্রন্থে সংখ্যাটি আশি হাজার বলে মন্তব্য করেছেন। শ্রীরঙ্গপত্তনম দখল করার পরে টিপু সুলতান সেখানকার ত্রিশ হাজারেরও বেশি নায়ার হিন্দুকে, নিষ্ঠুর অত্যাচার করে শেষে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ, মহিলা ও শিশু সবাই ছিল।

হিন্দুদের জোরজবরদস্তি করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার এমন উদগ্র ইচ্ছা টিপুর চিঠিতেও পাওয়া যায়। মালাবার উপকূলের বেকলের (ত্রিবাঙ্কুরের কাছে) শাসনকর্তা বদরুজ্জামান খানকে ১৯.০১.১৭৯০ সালে লেখা চিঠিতে টিপু লেখেন, 'জানো কি, সম্প্রতি আমি এক বিরাট জয় পেয়েছি মালাবার উপকূলে এবং চার লক্ষের বেশি হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। আমি স্থির করেছি, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রমন নায়ারের বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযান করব যেহেতু আমি তাঁকে এবং তাঁর প্রজাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার সম্ভাবনায় অত্যন্ত খুশি। সেইজন্য আমি শ্রীরঙ্গপত্তনমে এখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা খুশি মনেই ত্যাগ করেছি।' কী অপূর্ব ভাষা সহিষ্ণু শাসক টিপু সুলতানের!

শুধু হিন্দুই নয়, খ্রিস্টানদের উপর টিপু সুলতানের নির্যাতনও ছিল সীমাহীন। শ্রীরঙ্গপত্তনমে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের উপরে টিপু অবরোধ শুরু করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে যা ১৭৯৯ অবধি চলে। এ সম্পর্কে Barcoor manuscript-এর রিপোর্টে টিপু সুলতানের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে টিপু সুলতান বলেছেন, 'মুসলমানদের একত্রিত হওয়া উচিত এবং বিধর্মীদের উৎখাত করাকে পবিত্র কর্তব্য জ্ঞান করে, সমস্ত শক্তি ব্যয় করে সেই মহান কাজ করতে হবে। 'The Barcoor manuscript'-এ আরও বলা হয়েছে, 'Soon after the control of Canara, he issued orders to seize the Christians in Canara, confiscate their estates and deport them to Serigapatnam, the Capital of his Empire.' টিপু ফতোয়া জারি করলেন খ্রিস্টীয় সন্তের মূর্তি দিয়ে সুন্দরভাবে শোভিত ২৭টি গির্জা ধ্বংস করবার জন্য।

এই গির্জাগুলির মধ্যে ছিল ম্যাঙ্গালোরের 'নোসা সেনহোরা' গির্জা, মঞ্চে ম্যারিয়ানোর ফাদার মিরান্ডার 'সেমিনারি গির্জা', অমজুরের 'চার্চ অফ জেসু মেরি জোস', 'বোলারের চ্যাপেল' ইত্যাদি। ম্যাঙ্গালোরের প্রায় ত্রিশ হাজার রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানকে ইসলামে মতান্তরিত করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যুবতী, মহিলা ও কমবয়সি মেয়েদের মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। টিপু সুলতানের এই গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা শুধুমাত্র হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ইসলামে জোর করে ধর্মান্তরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বিভিন্ন স্থানের পুরনো হিন্দু নামগুলিও ইসলামি নামে পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রচুর উদাহরণ আছে এ ব্যাপারে।

সমকালীন ঐতিহাসিক ও লেখকদের লেখায় টিপু সুলতানকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অসহিষ্ণু আচরণের জন্য নিন্দা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান--- সব ধরনের ঐতিহাসিকই আছেন। কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক, চার্লস রস, এডওয়ার্ড মুর, কর্নেল উইলসন, মার্ক ইউলকস, হুসেন আলি খান কিরমানি, সিএইচ রাও প্রমুখ ঐতিহাসিকরা উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচএইচ ডডওয়েল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া', পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন, "He was a man of savage passions and vaulting ambition, whose capacities were not equal to his own estimation of his powers. He ruled as a convinced Muhammadan over a population of Hindus, whose ancient sovereigns his father had dispossessed and whom he had brutally persecuted. The district around Mysore abhorred him." আসলে শাসক হিসেবে কর্ণাটকের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ

টিপু সুলতানকে এতটাই ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে যা কোনো সহিষ্ণু ও প্রজারঞ্জক শাসকের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়। দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ, মার্ক উইলকস তাঁর 'Historical sketches of the South India' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, "Unlimited persecution united in detestation of his rule every Hindu in his dominations. In the Hindu, no degree of merit was a passport to his favour, in the Musalman no crime could ensure displeasure. Tipu in an age when barbarous where severity was vice and indulgent where it was virtue."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাঁর প্রজাদের শুভেচ্ছা নয়, তাঁর রাজত্বের স্থায়িত্ব একান্তভাবেই তাঁরই উপর নির্ভর করত। টিপু সবাইকেই সন্দেহ করত, সবার প্রতিই ছিল তার চরম নিষ্ঠুরতা। ফলে শ্রীরঙ্গপত্তনমে তার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার রাজ্যেরও পতন হয়। তাঁর পতনে কেউ দুঃখ পায়নি; এমনকী তার পুত্রেরাও নয়। টমাস মুনরো তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, 'also he was so suspicious and cruel that more of his subjects, none probably of his children, lamented his fall.'

অথচ দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস এবং বামপন্থী ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা এই টিপু সুলতানকেই ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বহুদিন ধরে। যে কারণে টিপু দেশীয় মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন সেই একই কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন। তাঁর সাম্রাজ্যকে বাড়ানো এবং রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধ। অন্য কোনো দেশাত্মবোধের ভাবনা থেকে তাঁর সামরিক অভিযানগুলি চালনা করেননি। তাহলে অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে তিনি যুদ্ধ না করে তাঁদের সাহায্যই চাইতেন। সেটা তিনি করেননি; উপরন্তু তিনি বিদেশি আফগানিস্তানের দুররানি শাসক জামান শাহের কাছে ভারত আক্রমণ করার আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন। এটা কোনো দেশপ্রেমিকের কাজ হতে পারে না। তিনি তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের কাছে কোনো শুভেচ্ছার দূত নয়, বরং ত্রাসের প্রতিভূ হিসেবেই দেখা দিয়েছিলেন। কিছু বামপন্থী ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিক দুই সুলতান ও নবাব— মহীশূরের টিপু সুলতান এবং বঙ্গের সিরাজ-উদ-দৌল্লাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

১৭৬৯ সালে ইংরেজ ও হায়দার আলির মধ্যে এক চুক্তি হয়। কার্ল মার্কসের কথায়, They (the English) made offensive and defensive treaty with Haidar and Colonel Smith. এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করবে না এবং প্রয়োজনের সময় পরস্পরকে সাহায্য করবে। আর এই চুক্তির বলে ইংরেজরা হায়দার আলিকে মহীশূরে ফিরে যেতে দেয়। ১৭৭০ সালে হায়দার আলি মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মারাঠা সেনাপতি মধু রাওয়ের হাতে হায়দার আলি পরাজিত হয় এবং মারাঠাদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করা এক কোটি টাকা দিতে অস্বীকার করে। মারাঠা সৈন্য তাঁর পশ্চাৎধাবন করে। হায়দার সারা রাত মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয় এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মারাঠা সৈন্যদের দ্বারা। হায়দার আলি কোনোক্রমে শ্রীরঙ্গপত্তনমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সে ১৭৬৯ সালের চুক্তির শর্ত অনুসারে ইংরেজদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু স্যার জন লিন্ডসে মারাঠাদের সঙ্গে তাঁদের চুক্তির উল্লেখ করে তাঁকে কোনো সাহায্য করেনি। এই ঘটনায় হায়দার আলি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাস্তবে হায়দার আলি এবং টিপু সুলতান বাস্তবে ইংরেজবিরোধী না হলেও কেন একসময় ইংরাজ বিরোধী হয়ে পড়লেন সে সম্পর্কে কার্ল মার্কসের Notes on Indian History গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি, 'In consquence of this deliberate breach of faith, Haidar Ali and his son Tipu Sahib swore on the Koran everlasting hatred for the English and to crush them.' আর তাই তাঁরা ইংরেজদের দমন করতে আরেক বিদেশি ফরাসিদের সাহায্য নিয়েছে তাদের এদেশে আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা সত্ত্বেও। এছাড়া টিপু সুলতান আরেক বিদেশি, আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ্‌-কে ভারতবর্ষ আক্রমণ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। সে একাজ করে কোনো দেশাত্মবোধ থেকে নয়; নেহাতই নিজের পিঠ এবং জবরদখল করা সাম্রাজ্য বাঁচানোর তাগিদে।

বাস্তবে এঁরা ছিলেন রক্তপিপাসু, অত্যাচারী, অবিবেচক ও অস্থিরচিত্ত শাসক। এঁরা নিজেরাও ছিলেন বিদেশি বংশোসম্ভূত, ভাগ্যান্বেষী শাসক। সিরাজ পলাশীতে পরাজিত হয়েছিলেন নিজের অপদার্থতা এবং নিজের বিশ্বস্ত সেনানী মোহনলালের কথা না শুনে নিজের আত্মীয়, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের উপর নির্ভর করায়। আর টিপু সুলতান প্রজাদের কাছে পরিচিত ছিলেন অত্যাচারী এবং মহীশূরের রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই। সুতরাং এঁরা আর যাইহোক, স্বাধীনতাযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। ইতিহাস তাঁদের গোঁড়া, নির্মম, অত্যাচারী শাসক হিসেবেই মনে রাখবে।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

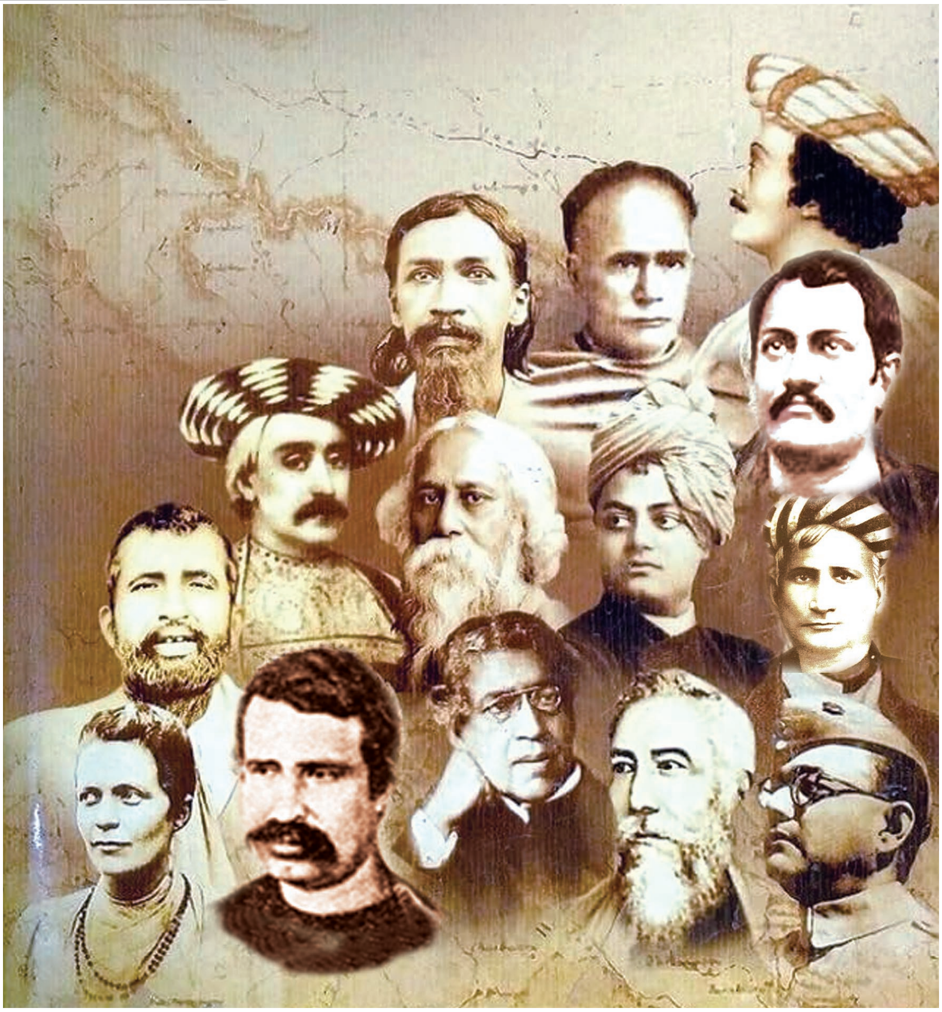

বঙ্গের নবজাগরণ : মিথ ও বাস্তবতা

তীর্থ চট্টোপাধ্যায়

রেনেসাঁ শব্দের অর্থ হলো পুনর্জাগরণ বা পুনরুদ্ধার। বঙ্গের রেনেসাঁ বলতে সাধারণত ব্রিটিশ রাজত্বকালের শেষ ভাগে, আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত বঙ্গের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনকে বোঝানো হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সময় বঙ্গে ঠিক কী পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্ধার হয়েছিল? বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ব্রিটিশ ও ফরাসি শাসকদের সরকারি দলিলপত্র এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ একেবারে ভিন্ন এক চিত্র তুলে ধরে।

ইসলামি আক্রমণের আগে বঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতি :

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গের কর্ণসুবর্ণে অবস্থিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার নামে এক বিশাল বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজও বিদ্যমান। সেখানে ছিল প্রায় ৪০টি অধ্যয়নকক্ষ ও ১০টি সঙ্ঘারাম (ভিক্ষু-আবাস)। তাম্রলিপ্তের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মোগলমারি-সহ ওই অঞ্চলে ছিল একাধিক বৌদ্ধবিহার ও প্রায় ৫০টি মন্দির, যেখানে প্রায় এক হাজার পুরোহিত বাস করতেন। এই সমস্ত বৌদ্ধবিহার ছিল বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, দর্শন ও সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র। (Beal, 1884, pp. 200-204)

বঙ্গের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে ইসলামি আক্রমণের প্রভাব :

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে আক্রমণের পর অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই অন্তত দশ থেকে বারোটি বৌদ্ধবিহার ইসলামি আক্রমণকারীদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় (Juzjani, 1881, pp. 551-560)। তবে পশ্চিমবঙ্গের বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার অব্যাহত থাকে। এই সময়ে এক বাঙ্গালি পণ্ডিতের কাছে অসমের রাজার বৈদিক শিক্ষা গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় (Chevalier, 2020, p. 187)। চৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, আনুমানিক ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে আগত প্রথম ইংরেজ পর্যটক রালফ ফিচ (Ralph Fitch) তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে মালদা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বৈদিক সমাজের উল্লেখ করেছেন (Fitch, 1899, pp. 100, 119)।

প্রারম্ভিক ব্রিটিশ শাসনকালে বঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

(১৭৫৭-১৮১৩) :

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রারম্ভে, ব্রিটিশরা স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল। এমনকী প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নিয়মিত কালীঘাটে গিয়ে কালীপূজা করতেন (Sengupta, 1971, p. 56)। স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে। জেমস প্রিন্সেপ ও তাঁর ভাই হেনরি থোবি প্রিন্সেপের মতো কিছু ব্রিটিশ বিদ্বান সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শনের প্রবল সমর্থক ও অনুরাগী হয়ে ওঠেন (Stark, 1916, p. 19)। ১৮১১ সালে গভর্নর- জেনারেল মিন্টো নবদ্বীপে ও তিরহুত (বিহার)-এ দুটি হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যদিও তা পরবর্তীতে বাতিল করা হয় (Adam, 1941, p. 76)। এই সময়েই নাটোরের জমিদার রানি ভবানীর (১৭৪৮-১৮০৩) পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববঙ্গের নাটোর ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে বেশ কিছু বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় (Adam, 1941, p. 166)।

ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন ও মিশনারি শিক্ষার উত্থান :

কয়েক দশকের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ব্রিটিশদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে শুরু করে। খ্রিস্টান মিশনারিরা বঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মিশনারি শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে শুরু করলে তারা স্থানীয়দের থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়— কিছু শিক্ষাকেন্দ্র আক্রমণ ও ধ্বংস করা হয়, আবার কিছু শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় আগ্রহের অভাবে, বিশেষ করে সমাজের নিম্নবিত্ত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হিন্দুদের পক্ষ থেকে মিশনারি শিক্ষার প্রতি প্রবল অনাগ্রহের কারণে (Adam, 1941, p. 60)। মিশনারিরা দ্রুত বুঝতে পারে যে হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মান্তরকে কঠিন করে তুলছে, এর অন্যতম কারণ, ইংরেজিতে খ্রিস্টান মতের প্রচার কার্যত ফলপ্রসু হচ্ছিল না।

Government of India Act, 1833 এবং ব্রিটিশ ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা :

১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট Government of India Act- এর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এটিই ১৮৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে পূর্ণতা পায়। এর ফলে দেশীয় ভারতীয়দের ব্রিটিশ প্রশাসনে, এমনকী সিভিল সার্ভিসেও যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন থেকে ভারতের গভর্নর-জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে নির্দেশ পাঠানো হয় যে, তিনি তৎকালীন প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অর্থানুকূল্য বন্ধ করবেন এবং ইংরেজি শিক্ষাকে উৎসাহ দেবেন, যাতে দেশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে ইংরেজি-শিক্ষিত কর্মচারী গড়ে তোলা যায় (Stark, 1916, p. 20)।

ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক যাঁরা বৈদিক শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতেন— যেমন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য থমাস ব্যাবিংটন মেকলে ও তাঁর ভগ্নীপতি সরকারি কর্মচারী চালর্স ই. ট্রেভেলিয়ান— তাঁরা ভারতীয় শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেন। অপরদিকে, জেমস প্রিন্সেপের মতো ভারতীয় সংস্কৃতি-অনুরাগী ও প্রাচ্য-বিদ্বানরা এই পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেন (Stark, 1916, p. 21)।

ঠিক এই সময়ে ভারতে আসেন থমাস মেকলে, যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচ্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন। ট্রেভেলিয়ান ছিলেন ভারতীয় ও হিন্দু সংস্কৃতির তীব্র বিদ্বেষী (Trevelyan, 1838, p. 57); তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি ভাষার প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে খ্রিস্টান মত ও ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব— যেমন একসময় আরবরা ইসলামি অভিযান ও আরবি ভাষার মাধ্যমে করেছিল (Trevelyan, 1838, p. 46)।

বঙ্গের উইলিয়াম অ্যাডামের শিক্ষাসমীক্ষা (১৮৩৫-১৮৩৮)

ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী এবং সংস্কৃত জানা উইলিয়াম অ্যাডাম বেন্টিঙ্ককে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে একটি শিক্ষাসমীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করেন (Stark, 1916, p. 25)। অ্যাডাম ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে এই সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ করেন এবং তার— ***Reports of the State of Education in Bengal (1835-1838)*** জমা করেন। তাতে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শিক্ষা-ব্যবস্থার বিস্তারিত ছবি পাওয়া যায়।

(১) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে— অন্তত এক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা ছিল (Stark, 1916, p. 57)। প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক পাঠশালা স্থানীয় বাসিন্দা বা জমিদারদের অনুদানে হরিবাসর, শিবমন্দির অথবা চণ্ডীমণ্ডপে চলত (Adam, 1941, p. 236)। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি প্রাথমিক গণিত শেখানো হতো। পাঠ্যক্রমে থাকত পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে গল্প এবং ভগবদ্গীতা ও গীতগোবিন্দ থেকে শ্লোকপাঠ (Adam, 1941, p. 65)।

(২) বঙ্গের নানা স্থানে বেশ কিছু সংস্কৃত টোলও ছিল, যেখানে ধর্মশাস্ত্র, ন্যায় (যুক্তিশাস্ত্র), রাজনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ পড়ানো হতো। যদিও সংস্কৃত শিক্ষা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিত না, তবুও বহু মানুষ সামাজিক মর্যাদা ও বৌদ্ধিক স্বীকৃতির জন্য বৈদিক ও সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং চর্চা চালাতেন (Adam, 1941, p. 65)। 'পূর্বের বারাণসী' নামে পরিচিত নবদ্বীপ ছিল বঙ্গের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র (Adam, 1941, p. 76)। কলকাতার হাতিবাগান ও ভাটপাড়ার কয়েকটি বৈদিক শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও, নবদ্বীপে বিখ্যাত পণ্ডিতদের পরিচালনায় একত্রিশটি (Adam, 1941, pp. 75-78) এবং ত্রিবেণীতে বাইশটি বৈদিক কলেজ ছিল (Adam, 1941, pp. 57-58)। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বঙ্গ ও দেশের বাইরে থেকেও বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসত (Adam, 1941, p. 81)। দরিদ্র ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক সময় স্থানীয় মানুষ বহন করতেন (Adam, 1941, p. 58)।

(৩) সে সময় ফারসি ছিল সরকারি ভাষা। তাই বহু মানুষ সরকারি দপ্তরে চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তবে এই শিক্ষা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ছিল (Adam, 1941, pp. 279-283)।

(৪) সমীক্ষা-রিপোর্টে বারো বছরের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জাতিগত বিন্যাসের বিস্তারিত পরিসংখ্যান আছে। দেখা যায়, পাঠশালায় যেমন বহু শিক্ষক এবং সমাজের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী— যেমন সাঁওতাল, ধাঙড়, ডোম, মুচি, চণ্ডাল ও বাগদি— এর সদস্য ছিলেন (Adam, 1941, pp. 234-237, 239-241), ঠিক তেমনি টোল বা গুরুকুলেও একাধিক ছাত্র পড়াশোনা করত যারা ব্রাহ্মণ নন (Adam, 1941, p. 274)। এটি প্রমাণ করে যে শিক্ষার মাধ্যমে সেইসব গোষ্ঠীর মানুষ ক্রমে সমাজে উচ্চবর্ণের মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছিলেন।

(৫) অ্যাডাম তৎকালীন বহু বাঙ্গালি লেখকের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

তাঁদের অধিকাংশই সংস্কৃতে চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন ইত্যাদি নানা বিষয় রচনা করতেন। তাঁর রিপোর্টে তিনি বর্ধমানের সাতজন (Adam, 1941, pp. 262-265), বীরভূমের চারজন (Adam, 1941, p. 259) এবং দক্ষিণ বিহারের দু'জন (Adam, 1941, p. 268) বিশিষ্ট লেখকের নাম ও তাঁদের রচনাসমূহের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত লেখক রঘুনন্দন গোস্বামী, যিনি বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামের কাছে মারো গ্রামে বাস করতেন। তিনি মোট আটত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে রামায়ণের ওপর ভিত্তি করে লেখা রামরসায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Adam, 1941, p. 262)।

(৬) রিপোর্টে পূর্ববঙ্গের (রাজশাহী ও নাটোর ছাড়া) জেলাগুলিতে ইসলামীকরণ, দারিদ্র্য ও দাসত্বের ফলে শিক্ষা ও সমাজের করুণ অবস্থার কথাও তুলে ধরা হয়েছে (Adam, 1941, p. 159)। সেখানে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষক, যা কেবল ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (Adam, 1941, p. 48)।

(৭) অ্যাডাম পাঠশালা ও উচ্চশিক্ষাকে অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং ছাপা বই, মানচিত্র ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার আধুনিকীকরণ বিষয়ে তার রিপোর্টে বিশদ আলোচনা করেছেন (Adam, 1941, pp. 358-366, 418-431)।

ফিল্ট্রেশন তত্ত্বের সূচনা এবং স্থানীয় শিক্ষার বিলোপ :

উইলিয়াম অ্যাডামের পেশ করা প্রস্তাবটি মেকলের সভাপতিত্বে গঠিত জেনারেল কমিটি প্রত্যাখ্যান করে। তার পরিবর্তে, তারা মেকলের 'ফিল্ট্রেশন ডকট্রিন'-এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, 'শিক্ষার প্রবাহ সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণীর দিকে ছড়িয়ে পড়ে।' কিন্তু মি. অ্যাডাম মনে করতেন না যে এই তত্ত্ব বঙ্গ ও সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সেই কারণে তিনি পদত্যাগ করেন (Stark, 1916, pp. 55-56)।

১৮৩৭ সালের ৩১ জুলাই মেকলে লিখলেন— 'আমরা এই মুহূর্তে শ্রেণী তৈরি করা, যারা ভবিষ্যতে আমাদের দেওয়া জ্ঞানের কিছু অংশ স্বজাতিদের মধ্যে প্রচার করতে পারবে' (Stark, 1916, p. 55)।

স্থানীয় শিক্ষার বিলোপে কলকাতার অভিজাত ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন :

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত অভিজাত বাঙ্গালিরা ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা বৈদিক প্রাচ্য শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করে ব্রিটিশ ইউরোপীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগিতা করেন। ব্রাহ্মসমাজের এক বিশিষ্ট সদস্য, আলালের ঘরের দুলালের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের দাদাবাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩) ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বলেছিলেন— 'সমাজের নিম্নস্তরকে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত করতে হলে তা উচ্চস্তর থেকেই সঞ্চারিত হতে হবে। এই নিম্নমুখী প্রবাহ যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, তার প্রমাণ স্পষ্ট— ডিরেক্টরদের কোর্টের ডেসপ্যাচ কার্যকর হওয়ার পর অসংখ্য বিদ্যালয় ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত করুন, তাহলে নিম্ন শ্রেণীও শিক্ষিত ও উন্নত হবে' (Stark, 1916, p. 89)।

বঙ্গের নবজাগরণের পুনর্মূল্যায়ন ও প্রভাব :

ঐতিহাসিকভাবে, বৌদ্ধবিহারকেন্দ্রিক জ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন জনপদে অসংখ্য পাঠশালা ও টোলের মাধ্যমে বৈদিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, তবে তা কখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, 'ফিল্ট্রেশন থিয়োরি'-র ভিত্তিতে তথাকথিত রেনেসাঁর যুগে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাসংশোধন বঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে গভীরভাবে দুর্বল করে দেয়। ১৮২০ সালে ভারতের মোট দেশীয় উৎপাদন (জিডিপি) বিশ্বের মোট উৎপাদনের (গ্লোবাল জিডিপি) প্রায় ১৬ শতাংশ ছিল, যা ১৯৪৭ সালে নেমে আসে মাত্র ৪ শতাংশে। ব্রিটিশ শিক্ষাসংস্কার শুধু বঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজকে শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই শিক্ষানীতি ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিগত বিভেদের অন্যতম মূল কারণ হিসেবে দেখা দেয়।

ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল মেয়ো (১৮৬৯- ১৮৭২) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমি এই ফিলট্রেশন থিয়োরিটা মোটেও পছন্দ করি না', মেয়ো এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'সমগ্র বঙ্গে আমরা বিশাল ব্যয়ে কয়েকশো বাবুকে ইংরেজি শিক্ষা দিচ্ছি। তাদের অনেকেই নিজেদের খরচে পড়াশোনা করতে সক্ষম, আর তাদের শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সরকারি চাকরি পাওয়া। এরই মধ্যে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য কিছুই করছি না। বাবুরা কখনো তা করবে না। তুমি যত বেশি শিক্ষা দেবে, তারা ততই তা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সেই জ্ঞানকে অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। যদি তুমি অপেক্ষা করো যতক্ষণ না কলকাতার চারশোবাবুর শেখা খারাপ ইংরেজি চল্লিশ মিলিয়ন বাঙ্গালির মধ্যে 'ফিল্টার' হয়ে পৌঁছায়, তখন তুমি বিচারকের অবসর নয়, বরং এক সিলুরিয়ান পাথরে পরিণত হবে। বাবুরা ইংরেজি শিখুক, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু আমাদেরও কিছু করা উচিত 'গ্রামীণ বঙ্গকে' পড়া, লেখা আর অঙ্ক শেখানোর জন্য।' (W.W. Hunter, 1876, p. 303)।

References :

Adam, W. (1941), Reports on The State of Education in Bengal (1835-38). Calcutta : Calcutta University.

Beal, S. (1884), Buddhist Records of The Western World, Vol. 2. London : Trubner & Co., Ludgate Hill.

Chevalier, J.-B. (2020), The Adventures of Jean-Baptiste Chevalier in Eastern India (1752-1765). Guwahati : LBS Publications.

Fitch, R. (1999), England's Pioneer to India and Burma, London : T. Fisher Unwin.

Juzjani, M.-I.S. (1881), Tabaqat-i Nasiori, Volume 1. Translated from Original Persoan Manuscripts, By Major H.G. Raverly. London : Gilbert & Rivington.

Sengupta, K.P. (1971), The Christian Missilnaries in Bengal 1793-1833. Calcutta L Firma K.L. Mukhopadhyay.

Stark, H.A. (1916), Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912. Calcutta : The Calcutta General Publishing Co.

Trevelyan, C.E. (1838), On The Education of The People Of India 1838. London : Longman, Onme, Brown, Green & Longmans.

W.W. Hunter, (1876), A life of the Eari of Mayo, Volume 2, 2nd Edition. London : Smith, Elder & Co.

বাম জেহাদিদের তথাকথিত পূর্বপুরুষ তিতুমির

দীপক খাঁ

পশ্চিমবঙ্গে বাম জেহাদিদের পছন্দমতো মহাপুরুষদের আকাল পড়েছে বহুদিন ধরেই। তারা তাঁদের বশংবদ ঐতিহাসিক বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে আদ্যোপান্ত জেহাদি তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানিয়ে বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করে ইতিহাসের পাতায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলিকে ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয় প্রতি বছর ২৭ জানুয়ারি তিতুমিরের জন্মদিন পালনের জন্য। তিতুমির ইংরেজ তাড়াতে বাঁশের কেল্লা তৈরি করে লড়তে যায়নি। চেয়েছিল ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বঙ্গভূমিকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে।

আর এই জেহাদেই তাঁর মৃত্যু হয়, তাই তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী অভিধায় ভূষিত করার জন্য বাম-সেকুলারদের কী অপরিসীম চেষ্টা! তাঁর স্মৃতিতে 'বাঁশের কেল্লা' নামে প্রতিবেশী বাংলাদেশের জামাত গোষ্ঠীর একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের আমলে শাহরুখ আহম্মদ শিরহিন্দি নামের এক ইসলামি কট্টরপন্থীর উদ্ভব ঘটে, যে নিজেকে 'মুজাদ্দিদে আলফে সানি' বলে দাবি করে। ভারতে আগত ইসলাম বহু ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে তাঁর আদিরূপ ধরে রাখতে পারেনি। বহু হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিতে হয়েছিল ইসলামকে। ফলে মরু-আরবের ইসলাম আর গঙ্গা-গোদাবরী বিধৌত ভারতের ইসলামের মধ্যে একটা বড়ো ধরনের ফারাক তৈরি হয়। প্রচণ্ড হিন্দু বিরোধী আহম্মদ শিরহিন্দি ভারতের এই ইসলামকে স্বীকার করেনি।

মুঘল শাসনের অবসানে উদ্ভব হয় আরেক কট্টরপন্থী। তার নাম শাহওয়ালিউল্লাহ দেহলভি। হিন্দুদের দমন করে দেহলভি ভারতকে পরিণত করতে চাইল 'দার-উল-ইসলামে', কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব পড়ল আরেক কট্টরপন্থী সাইদ আহমদের উপর। জেহাদি সংগঠন তৈরি করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিশ্বজুড়ে আল্লার রাজত্ব কায়েম করার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল এই ইসলামি মোল্লা। সে যে আন্দোলন শুরু করেছিল ইতিহাসে 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, উপমহাদেশে দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বালাকোটের যুদ্ধে নির্মমভাবে মৃত্যু ঘটে।

এই সাইদ আহমেদ বরেলভি যখন হজযাত্রার উদ্দেশে কলকাতায় আসেন, তখন বহু মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই শিষ্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বারাসাতের মির নিসার আলি ওরফে তিতুমির। যৌবনে নদীয়ায় এক হিন্দু জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করে। কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষে যশোহর জেল থেকে বেরিয়ে সে 'তাবিকায়ে মুহম্মুদিয়া'য় যোগ দেয়।

তিতুমিরের উদ্ভবের আগে ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশে একটি মিশ্র সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতি বিরাজ করত। হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রার মধ্যে কিছু অমিল থাকলেও তার উগ্রতা ছিল না। গ্রামীণ মুসলমানদের মধ্যে জেহাদি মানসিকতা একেবারে ছিল না। ফলে আচার-আচরণ হিন্দুদের মতোই মানবিক ছিল। ছোটো ধুতি, কাঁধে গামছা এই ছিল গ্রামের সাধারণ মুসলমানদের পোশাক। দাড়ি রাখা বা না রাখার বাছবিচার ছিল না। তাদের নামগুলি হিন্দুদের মতো। যেমন পুরুষদের নাম— দায়েম, কায়েম, সাজন, দানেশ, শেহেজান, শিহাম, মধু এবং মেয়েদের নাম বাতাসী, কুড়ানী, শারী, শোভানী ইত্যাদি। মুসলমানরা নামাজ পড়ত ঠিকই তবে আরবি শব্দের অর্থ না জেনেই। □

ফ ঃ ৩

নাগরিক কর্তব্যবোধ পালনে মহিলাদের ভূমিকা

সুতপা বসাক ভড়

আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক। আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীন করার জন্য অনেকে আত্মবলিদান করেছেন। তাঁদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ। তাঁদের জন্যই বর্তমানে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য একজন স্বাধীন নাগরিকরূপে আমরা অনুভব করছি। এখন যদি ভাবি যে, একজন ভারতবাসী হিসেবে আমার কী কর্তব্য? উত্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসবে, যেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো নাগরিক কর্তব্য। একজন আদর্শ নাগরিকের কী ভূমিকা হতে পারে, সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হলো।

দেশের আইন-শৃঙ্খলা, পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য স্বেচ্ছাচারের কোনো স্থান নেই। সেজন্য আমরা সবাই নাগরিক কর্তব্য অবশ্যই মেনে চলতে হবে। দৈনন্দিন দিনচর্যায় সকাল থেকে বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে হবে। প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে জলের অনর্থক অপচয় না হয়, সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একজন আদর্শ নাগরিক নিজ বাসস্থান এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি দায়িত্ববান হবেন। কর্মসূত্রে বাড়ির বাইরে বেরোনোর সময়, যানবাহন চলাচল সম্পর্কিত নিয়মগুলি সঠিকভাবে পালন করবেন— এমনটাই বাঞ্ছনীয়। রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে। এছাড়াও ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশানুসারে হেলমেট, সিটবেল্টের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। এটা নিজের নিরাপত্তার জন্যই। বৈধ লাইসেন্স কাছে রাখতে হবে। ট্রেনে-বাসে অযথা বাক্‌বিতণ্ডা বা গোলযোগ না করে সহযাত্রীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যাত্রা করাই সুনাগরিকের পরিচয়। সার্বজনীন স্থানে জোরে কথা না বলা, অভদ্র ব্যবহার, জোরে হর্ন বাজানো উচিত নয়, সার্বজনীন সম্পদের প্রতি যত্নবান হওয়া একজন সুনাগরিকের কর্তব্য। বিভিন্ন জাতীয় সম্পত্তি, যেমন--- খেলার মাঠ, পার্ক, ঐতিহাসিক স্থান, পর্যটনকেন্দ্র, পাঠাগার, পরিবহণ ইত্যাদির সংরক্ষণ ও যত্ন আমাদের সবাইকে নিতে হবে। এছাড়া নিয়মিত কর, বিদ্যুৎবিল ইত্যাদি সময়মতো জমা করে সরকারের কাজে সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য। একজন সচেতন নাগরিক রূপে আমরা অবশ্যই ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। আমাদের প্রত্যেকটি ভোট দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্থিতি সুরক্ষিত করে, সেজন্য আমাদের এবিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সকলের মূল্যবান ভোট দিতে হবে।

নিজেদের পরিচয়পত্র, যেমন— আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড ইত্যাদি যথাযথভাবে রাখা প্রয়োজন। প্রযুক্তির প্রভাব থেকে সামাজ ব্যতিক্রম নয়, এগুলির ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট যত্নশীল ও সতর্ক থাকতে হবে। জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় প্রতীকের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

একজন আদর্শ নাগরিকরূপে সকলকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই অনুসারে চলতে হবে। মহিলারা নিজগৃহের প্রতিটি স্থান যেমন ব্যবস্থিত রাখেন, সেইরকম নাগরিক কর্তব্যের বিষয়েও আমাদের সচেতন হতে হবে। অধিকাংশ মহিলা সুচারুরূপে এগুলি পালন করে থাকেন, তবে বাড়িতে, কার্যালয়ে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মশালা, আলোচনার মাধ্যমে, সর্বোপরি নিজ ব্যবহারের দ্বারা আমরা অন্যদের প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হব— তবেই আমাদের এই পুণ্যভূমি- মাতৃভূমির সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে। □

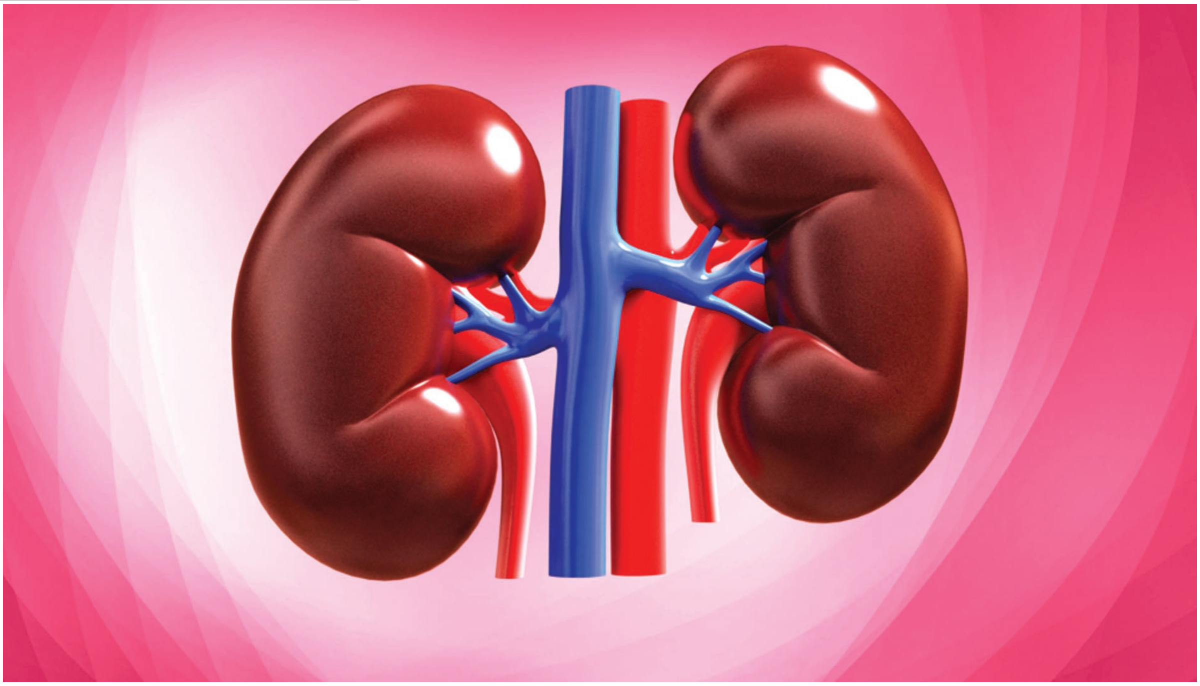

কিডনির সমস্যা প্রতিরোধে খাদ্যের তালিকা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ভারতে কিডনি রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ঘনঘন ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়া, অতিরিক্ত ওজন ছাড়া আরও নানা কারণে কিডনি রোগ হতে পারে। যে কারণেই কিডনির সমস্যা হোক না কেন দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের চিকিৎসা প্রধান উপায় হলো সঠিক পথ্য নির্বাচন। অন্যান্য রোগের চেয়েও খুব হিসেবনিকেশ করে কিডনি রোগীর চিকিৎসায় পথ্য নির্ধারণ করতে হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধিকে ধীর গতিতে রাখার জন্য সঠিক পথ্য কার্যকরী।

সঠিক পথ্য মেনে চললে রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। রোগী ভেদে কিডনির পথ্য নির্ধারণে ভিন্নতা থাকে। রক্তে ইলেকট্রোলাইটসের পরিমাণ, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ, রক্ত ও ইউরিনে অ্যালবুমিনের পরিমাণ এবং ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ভেদে পথ্যকে সাজাতে হয়। একজন ক্লিনিক্যাল ডায়েটেশিয়ানের পরামর্শ নেয়া একান্ত জরুরি। সাধারণভাবে যে বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন সেগুলো হলো :

ক্যালরি : কিডনি রোগীদের সাধারণত ক্যালরির চাহিদা অন্যান্য রোগীর তুলনায় বাড়ানো হয়, যথাযথ শক্তি প্রদান করার মাধ্যমে রোগীর মাংসপেশির সরলতা বজায় রাখতে ক্যালরি সাহায্য করে। সাধারণত প্রতি কেজি ওজনের জন্য রোগী ভেদে ৩০ থেকে ৩৫ কিলো-ক্যালরি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এই ক্যালরি রোগীকে শক্তি প্রদান করা ছাড়াও সচল ও কর্মক্ষম রাখে।

কার্বোহাইড্রেট : কিডনি রোগীর মোট ক্যালরি চাহিদার বেশিরভাগ কার্বোহাইড্রেটের মাধ্যমে পূরণ হয়। কার্বোহাইড্রেট কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে বন্ধুবৎ। খাবারে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বলে কার্বোহাইড্রেটকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে শর্করার মাত্রা বিবেচনা করে কার্বোহাইড্রেট হিসাব করা হয়। ভাত, ময়দার রুটি, চিড়া, সুজি, চালের গুঁড়া, চালের রুটি, সাগু, সেমাই ইত্যাদি কিডনি রোগীর জন্য উত্তম কার্বোহাইড্রেট।

প্রোটিন : প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগে প্রতি কেজি ওজনের জন্য পয়েন্ট পাঁচ থেকে পয়েন্ট আট গ্রাম প্রোটিন বরাদ্দ করা যেতে পারে। যদিও এই হিসাব নির্ভর করবে রোগীর অবস্থা ও বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর। সাধারণত ডাল, বাদাম, কাঁঠালের বীজ, শিমের

বীজ ইত্যাদি রোগীকে বর্জন করতে হয়। প্রতিদিনের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা ডিমের সাদা অংশ, মাছ, মুরগির মাংস ও দুধ বা দই ইত্যাদি থেকে হিসাব করে বরাদ্দ করা হয়। খাসির মাংস, মেটে, মগজ ইত্যাদি অবশ্যই এড়িয়ে যেতে বলা হয়।

চর্বি : বেশিরভাগ কিডনি রোগীই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন। কিডনি রোগীদের যাতে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে না যায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে তাই চর্বির হিসাব যথাযথভাবে করতে হয়।

সাধারণত স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত চর্বি জাতীয় খাবার, ভাজাপোড়া খাবার, ফাস্ট ফুড, ডিমের কুসুম এড়িয়ে যেতে হয়। রান্নার তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্ভিজ তেল, সূর্যমুখী, কর্ন অয়েল, ক্যানোলা অয়েল ইত্যাদি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। অনেক কিডনি রোগী ভয়ে খাওয়া বন্ধ করতে দেখা যায়। যা একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। প্রতিদিনের রান্নায় চার চামচ (২০এমএল) তেল ব্যবহার করলে ভালো।

সবজি : রক্তে পটাশিয়াম, ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা, ফসফরাস ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সবজি হিসেব করা হয়। অতিরিক্ত পিউরিন ও পটাশিয়ামসমৃদ্ধ শাকসবজি, পিচ্ছিল ও গাঢ় লাল রঙের শাকসবজি এড়িয়ে যেতে হবে। কিডনি রোগীদের জন্য চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙে ইত্যাদি পানীয় সবজি উপকারী। উপকারী হলেও এগুলোর পরিমাণ মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচা সবজির স্যালাড, সবজি স্যুপ ইত্যাদি কিডনি রোগীদের এড়িয়ে চলতে হয়।

ফল : কিডনি রোগীদের ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হয়। অক্সালিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, রক্তচাপ ছাড়াও আরও অনেক কিছু বিবেচনা করে ফল নির্ধারণ করা হয়। তিন চারটি ফল রোগী ভেদে সীমিত আকারে দেওয়া হয়। যেমন— আপেল, পাকা পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি। অনেকেই কিডনি রোগ হলে ফল খাওয়া বন্ধ করে দেন। যা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এক্ষেত্রে রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বিবেচনা করে ফল নির্ধারণ করতে হবে।

লবণ : লবণ বা সোডিয়াম নিয়ন্ত্রিত পথ্য কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে জরুরি। রক্তচাপ, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা, ইডিমা বা শরীরের জল পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লবণে পরিমাপ করা হয়। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ গ্রাম লবণ নির্ধারণ করা হয়— যা নির্ভর করবে আপনার শারীরিক অবস্থা ও ডায়েটেশিয়ানের ওপর। আলাদা লবণ গ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং অতিরিক্ত সোডিয়ামযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। যেমন—চিপস, পাপড়, চানাচুর, আচার ইত্যাদি। যা শুধু কিডনি রোগীর চিকিৎসায় নয়, কিডনি রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

তরল বা পানীয় : কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে তরল নিয়ন্ত্রণ জরুরি। দৈনিক চা, দুধ, জল সব মিলিয়ে তরলের হিসেব করা হয়। কোনো রোগীকে কতটুকু তরল বরাদ্দ করা হবে তা নির্ভর করবে রোগীর অবস্থার ওপর। শরীরের ইডিমা, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, সোডিয়ামের মাত্রা, ইজিএফআর— এসবের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে এক থেকে দেড় লিটার, কখনো কখনো দুই লিটার পর্যন্ত তরল বরাদ্দ হয়। অনেকেই অসুস্থ কিডনিকে সুস্থ করার জন্য অতিরিক্ত জল খায়, এটি ভুল।

দীর্ঘমেয়াদি ক্রনিক কিডনি রোগী এই ধরনের খাবারের পরামর্শ মেনে চললে কিডনিকে মারাত্মক জটিলতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। একঘেয়েমি হলেও ধৈর্যের সঙ্গে সঠিক পথ্য ব্যবস্থাপনা মেনে চলা প্রত্যেক কিডনি রোগীর জন্য জরুরি। কিডনি রোগীদের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য খাদ্যতালিকা বা রুটিন অনুযায়ী খাবার খেতে হবে। নীচে তাদের খাবার নিয়ে আলোচনা করা হলো :

যেসব সবজি খাবেন : চিচিঙ্গা, লাউ, করলা, বিচি ছাড়া শশা, সজনা, ডাঁটাশাক, লালশাক, কচুশাক, ঝিঙে, পেঁপে, হেলেঞ্চা শাক ইত্যাদি।

যেসব সবজি খাবেন না : ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, কচু, মুলো, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, গাজর, কাঁটালের বীজ, শিমের বীজ, মুলোশাক ইত্যাদি।

প্রাণিজ আমিষ : মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি সীমিত পরিমাণে খাবেন।

যেসব ফল খাবেন না : ডাব, কলা, আঙুর, একেবারেই খাবেন না। কেননা এতে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি। কিডনি রোগীদের রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা বাড়তে থাকে। কম পটাশিয়ামযুক্ত ফল, যেমন— আপেল, পেয়ারা, পাকা পেঁপে, নাসপাতি ইত্যাদি রোগীর খাদ্যতালিকায় প্রোটিন রাখতে হবে রোগের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে। যেমন— রোগীর রক্তে ক্রিয়েটিনিন, শরীরের ওজন, ডায়ালিসিস করেন কিনা, করলেও সপ্তাহে কটা করেন তার ওপর নির্ভর করে প্রোটিনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। কিডনি রোগ শনাক্ত হওয়ার পর প্রতিকেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন ০.৫-০.৮ গ্রাম। গুরুতর রোগীর জন্য ০.৫ গ্রাম। উপরোক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য তালিকা তৈরি করে খাবার খেলে কিডনি রোগ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। □

স্ট্রিট স্লোগানেই পথ হারালো মাওবাদ

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যে কোনো কাজ শুরু করলেই আসতে পারে ব্যর্থতা। কিন্তু ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেও কাজটি যার বা যাদের দ্বারা শুরু হয়, সে বা তারা জানে যে তার বা তাদের দেখানো পথেই সাফল্য আনবে পরবর্তী প্রজন্ম। 'বিপ্লবী' বা সংগ্রামীদের নীতিই তাই। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন 'বিপ্লবী'। ভারতজননীর এই দামাল সন্তানরা ছিলেন রাষ্ট্রসাধক ও বীর যোদ্ধা। এর বিপ্রতীপে ১৯৪০-এর দশক থেকে ভারতজুড়ে জন্ম নিতে শুরু করে 'বামপন্থী' নামধারী কিছু চরিত্রহীন ও ভণ্ড। কখনও ব্রিটেন, কখনও রাশিয়া, কখনও চীন বা আমেরিকার প্রকাশ্য বা গোপন মদতে ভারতে এই স্বঘোষিত বিপ্লবীরা শুরু করে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ। একদা ভারত বিভাজনের মাধ্যমে 'পাকিস্তান' গঠনের দাবিতে তারা সোচ্চার হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কার্টুন এঁকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তারা প্রকাশ করে।

এছাড়াও তাঁর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই কমিউনিস্টরা। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' উপাধি দান করলেও, তারা তাঁকে 'কুইসলিং' আখ্যা দেয়। তাদের 'অ্যানার্কিস্ট' বা নৈরাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণে হিংস্র, জেহাদি শক্তির হাত ধরে তারা। ১৯৪৭-এ তাদের উদ্দেশ্য সাধনে কিয়দংশে সফল হয় এই বাম-জেহাদি শক্তি। সংঘটিত হয় দেশভাগ। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও সর্বত্র চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় থাকে বামপন্থী দলগুলি। একসময় কমিউনিস্ট বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন— এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এছাড়া মার্কিন ও রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, কেজিবি-র পরিকল্পনাতেও আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয় বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতেও সিপিআই ভেঙে প্রথমে তৈরি হয় সিপিআই(এম) এবং তারপর তৈরি হয় সিপিআই(এম-এল)। বামপন্থার গর্ভ থেকে জন্ম নেয় অতিবাম চিন্তাধারা। সোভিয়েতপন্থীদের শিকল মুক্ত হয় চীনপন্থী, মাওবাদীরা। নকল বিপ্লবের নেশায় বুঁদ হয়ে, সকালে চা-পাঁউরুটি খেয়ে শুরু হলো বিপ্লব আন্দোলন বা দেওয়া হলো রক্তক্ষয়ী পরিবর্তনের ডাক। সকালে লড়াই শুরু হওয়ার পরই সাফল্যের হেডলাইন চলে এল সন্ধ্যার চায়ের সময়ে। 'ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি'-ভিত্তিক এই লালসন্ত্রাস যেন চলে অনেকটা এইরকম ফাটকাবাজি চিন্তায়।

এই অতিবামপন্থীরা কিছু বড়ো মাপের রাজনৈতিক দাবি করে, যা আধুনিক যুগে বেমানান ও হাস্যকর। তাদের আজগুবি দাবি হলো যে, তাদের নীতিভিত্তিক, জনমুখী, সশস্ত্র, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চিতভাবে সাফল্য বা তার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই এগোয়। বর্তমান সমাজ ও সময়ের নিরিখে পুরোপুরি পরিত্যজ্য মনে হলেও ধরে নিতে হবে 'মাওবাদ' হলো তাই। '৬০-এর দশকের শেষভাগে

এই ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারায় সিক্ত হয় বহু চনমনে তরুণ-তরুণী। হয়তো তাদের মগজধোলাই হওয়ার কারণেই জঙ্গিপনার আড়ালে '৭০-এর দশকের শেষদিকেও টিকে থাকে মাওবাদ। সম্প্রতি দেশজুড়ে মাওবাদী সন্ত্রাস দমন অভিযানের মধ্যেও গোটা দেশের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি জেলায় শিবরাত্রির সলতের মতো টিকে রয়েছে এই মাওবাদীরা। যদিও এই তথাকথিত বিপ্লবীদের 'সশস্ত্র' বিপ্লবকে সর্বদা 'ইন্টেলেকচুয়াল কভার' দিয়ে থাকে 'আর্বান নকশাল' বা শহুরে মাওবাদীরা। আঁতলামি, কুযুক্তি, মানবাধিকার ও বন্দিমুক্তি আন্দোলনের আবরণে এই সন্ত্রাসবাদীদের সযত্নে ঢেকে রাখার সচেতন প্রয়াস চালায় দেশদ্রোহী আর্বান মাওবাদের দল।

কারা এই আর্বান মাওবাদী? মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-আইআইটি-আইআইএমের কতিপয় শিক্ষক- অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা, বলিউড, টলিউড, থিয়েটার জগৎ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, এনজিও, এমনকী সরকারি আমলাতন্ত্র, পুলিশ-প্রশাসন, বিচার বিভাগ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এদের শাখা-প্রশাখা। মাওবাদী সংগঠনের বহিরাবরণ হলো এই 'ইকোসিস্টেম'। আর সংগঠনের ভিতরের মূল অংশটা? ২০১৪-র পর কেন্দ্রীয় নীতি পরিবর্তিত হওয়ায় দেশ আজ 'মাওবাদমুক্ত' হওয়ার পথে। ফলে পাহাড়-জঙ্গলে একে একে অনেক সশস্ত্র মাওবাদী কমান্ডার আধাসেনা অভিযানে আজ নিহত। ইকোসিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মূলধারার কিছু সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী অবশ্য তাদের নিহত হওয়ার কারণ হলো— 'এনকাউন্টার'। অনেক মাওবাদী নেতা ধরা পরছে, কেউ-বা করছে আত্মসমর্পণ। এই শেষটি বিপ্লবীসুলভ তো নয়, বরং বড্ড 'অ-বিপ্লবী' আচরণ! আত্মসমর্পণ কি একজন, দুই-পাঁচ বা একশোজন কমান্ডার কমরেড করল? উত্তর হলো— না। কতজন আত্মসমর্পণ করল সেই সংখ্যাতত্ত্বের থেকেও এই ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, মাওবাদীরা নয়, 'মাওবাদ' আত্মসমর্পণ করছে। তথাকথিত বিপ্লবীরা হয়তো সত্যিই রণক্লান্ত! দু'দশকের ত্রাস মাওবাদী কমান্ডার হিদমা খতম হওয়ার পর এটা আপাতত নিশ্চিন্ত যে, আপাতত ফোকাসে কোনো 'রাঘববোয়াল সন্ত্রাসী' নেই। ধরে নেওয়া যায় যে, মাওবাদী সন্ত্রাস এবার সমাপ্তি সুরে বাজছে। একদা বিপথগামী মাওবাদী ক্যাডাররা ধীরে ধারে ফিরছে সমাজের মূলস্রোতে।

কিন্তু ফিরে ফিরে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে যায় মাওবাদী সংগঠনের বহিরাবরণ। হিদমা'র মৃত্যুর পর রাজধানী দিল্লির রাজপথে একদল তরুণ ও ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংবাদ শিরোনামে আসে। বিক্ষোভরতদের পক্ষ থেকে স্লোগান ওঠে— 'কিতনে হিদমা মারোগি, হর ঘরসে হিদমা নিকলেগা...', 'লাল সেলাম' ইত্যাদি। খটকা এখানেই। তরুণ প্রজন্মের এই উদ্দীপনা 'বিপ্লবের পাগলামি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কোন যুক্তিতে? তরুণ বামপন্থীদের মধ্যে একটা বাড়তি আঁতলামি অনে সময়ই চোখে পড়ে। কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী-সহ তরুণ সমাজ কী দিচ্ছে, আর কীই-বা পাচ্ছে মাওবাদী আন্দোলনে? হিদমা'র মৃত্যুর পর দিল্লির পথে একদল ছাত্র-যুব যখন এইসব স্লোগান তুলল, তখন অনুমেয় যে, সন্ত্রাসী হিদমা'র মৃত্যু হলেও 'সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারা'র কী হাল। কোথা থেকে আসছে এই 'সন্ত্রাস মনন' তৈরির রসদ? জন্মগ্রহণের পর থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওবাদী) সব দিক থেকেই ব্যর্থ। গরিব, জনজাতি, বনবাসী মানুষের জীবনেক সার্বিকভাবে অতিষ্ঠ করা ছাড়া আর কী করল তারা? জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের কথা বলে প্রাকৃতিক সম্পদের অবাধ লুঠতরাজ এবং বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিস্তার ঘটাতে কি পারল তারা? এছাড়াও তাদের পিছনে আগাগোড়া কাজ করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত। ভারতের আর্থিক উন্নতিতে বিড়ম্বনায় পড়া বিভিন্ন বিদেশি শক্তি অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে ভারতেরই বিভিন্ন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা তাদের এজেন্টদের। এইসব ভারত-বিরোধী শক্তির এজেন্টদের কাজ হলো ভারতের আর্থিক বৃদ্ধিতে প্রতিনিয়ত বাধা দেওয়া। যে কোনো দেশ ও সমাজ নিজস্ব সংস্কৃতি, আদর্শ ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়। সেখানে 'যৌথ খামার'-এর বায়বীয় চিন্তাধারাকে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য ও সর্বশক্তিমান হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক মূর্খামির পরিচয়।

প্রশ্ন হলো, বার বার 'মাওবাদ' কেন ব্যর্থ? ভারতের বুক থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস খতম করতে এই বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হয় 'অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট'। গত ১৮ নভেম্বর, অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারামারাজু জেলার মারেডুমিলি বনাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয় মাওবাদী কমান্ডার মাড়বি হিদমা। সে ছিল সিপিআই(মাওবাদী) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পিপলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মির (পিএলজিএ-র) একজন কমান্ডার। ২০১৩ সালে ছত্তিশগড়ের দরভা উপত্যকায় তার নেতৃত্বে বড়ো ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা সংঘটিত হয়। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে তার মাথার ওপর ১ কোটি টাকারও বেশি পুরস্কার ঘোষিত হয়। একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম দাবি করে যে, 'ভুয়ো সংঘর্ষে' হিদমার মৃত্যু ঘটেছে। যদিও ভুয়ো সংঘর্ষ তত্ত্ব খারিজ করে নিরাপত্তা বাহিনী। তেলেঙ্গানার কাডাভেন্ডি গ্রামের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে 'লাল শহিদ স্তম্ভ'। কমিউনিস্টদের লেখা ইতিহাস অনুযায়ী, ১৯৪৬-১৯৫১-এর মধ্যে তেলেঙ্গানায় সংঘটিত হয় 'কৃষক বিদ্রোহ'। তৎকালীন অন্ধ্রের যত ছেলে-মেয়ে এই বিদ্রোহের অংশগ্রহণ করে মারা যান, তাদের সবার মরদেহ আনা হয়েছিল এই গ্রামে। গত ৩১ মার্চ নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয় মাওবাদী নেত্রী গুমাডিভেল্লি রেণুকা।

গত মে মাসে কাডাভেন্ডি গ্রামে তার দেহ নিয়ে এসে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়। গত ২১ মে মৃত্যু হয় আর এক শীর্ষ মাওবাদী নেতার। তিনি হলেন— সিপিআই(মাওবাদী) দলের সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজ। এই তেলেঙ্গানাতেই ১৯৭৮-১৯৮৫-র সময়কাল সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা গণবিপ্লব আনবে' বলে দাবি করে তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে নানা 'গণসংগঠন' তৈরি করে মাওবাদীরা। সেই সব গণসংঠন ওই

রাজ্যে এক অদ্ভুত সহমর্মিতা অর্জন করেছিল। এই ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে 'গণ-অভ্যুত্থান'-এর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে অনেকেই। প্রশ্ন হলো, আন্দোলনের শিকড় যখন এত গভীর, তখন তিন দশক পর কেন 'আত্মসমর্পণ' করল এই আন্দোলন? চূড়ান্ত ব্রেনওয়াশড্ মাওবাদীরা তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা স্বীকার না করলেও এটা স্পষ্ট যে, একটা সময়ের পর তাদের আন্দোলন হয়ে ওঠে চূড়ান্ত 'অসহনশীল'। তখন তারা মানুষের অধিকার নয়, সমান্তরাল দেশ বা প্রশাসনিক অধিকার চায়। তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদের সংগঠনের স্থায়ীত্ব চায় না, তারা চায় 'লিবারেটেড জোন' বা মুক্তাঞ্চল। সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ভারতীয় বামপন্থী দলগুলিকে 'সংশোধনবাদী' বলে দাগিয়ে দিয়ে থাকে এই অতিবামেরা। '৬০ বা '৭০-এর দশকের ভারত এবং বর্তমানে মহাকাশে চন্দ্রযান পাঠানো ভারত যে এক নয়, সেটা বুঝতে সক্ষম নয় মাওবাদী ক্যাডাররা। দরিদ্র জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের তারা এটাই বোঝায় যে, সরকার বা প্রশাসন হলো একটা শোষণ যন্ত্র। এই শোষকরা হলো 'শ্রেণীশত্রু'। এই শ্রেণীশত্রুদের নিকেশ করতে ছোটো ছোটো স্কোয়াডে সংগঠন গড়ে তোলো কমরেড। সহিংস সংগ্রামের পথে দেশের মূলধারা ও সংস্কৃতি থেকে জনগণকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে প্রথমে গ্রামাঞ্চল দখল। পরে গ্রাম দিয়ে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে দেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ। সেই কবে মাও-সে-তুং এইসব তত্ত্ব আউড়েছিলেন।

আজকের ভারতে নাকি এসব অচল, বস্তাপচা তত্ত্বের প্রয়োগ হবে! মাওবাদীদের এইসব আবর্জনাস্বরূপ চিন্তাধারা তাই কালে-দিনে এক আত্মঘাতী রূপ নিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাসবরাজের মৃত্যুর পর মাওবাদী পলিটব্যুরো সদস্য মাল্লোজুলা বেণুগোপাল রাও ওরফে ভূপতির আত্মসমর্পণের ফলে মাওবাদী সংগঠনে অভ্যন্তরীণ বিভাজন সৃষ্টি হয়। গত অক্টোবরে আত্মসমর্পণ করা প্রাক্তন পিএলজিএ সদস্য ওয়াম লখমু নিরাপত্তা বাহিনীকে হিদমা'র

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত মাওবাদী শীর্ষনেতা হিদমা

গতিবিধি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন, যার ভিত্তিতে মাওবাদী নিকেশ অভিযানের পরিকল্পনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য— ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে মাওবাদীমুক্ত ভারত। এই বছর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে ৩০০-রও বেশি মাওবাদী নিহত এবং ১৩০০-রও বেশি সদস্য আত্মসমর্পণ করায় সংগঠনটির সামরিক ক্ষমতা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে।

রাজনৈতিকভাবে ভুলের পর ভুল— একের পর এক 'ভুল' করেই চলেছে এই অতিবামপন্থীরা। তাই শেষমেশ হয়তো এই 'আত্মসমর্পণ'। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে 'বিপ্লবী' তথা 'গেরিলা' যোদ্ধারা এঁটে উঠতে না পেরে গা-ঢাকা দেবে। 'বিপ্লব' স্থগিত থাকবে। কিছু গেরিলা যোদ্ধার আত্মসমর্পণ কী তাদের দলের নীতিগত, ঐতিহাসিক ভুলকেই চিহ্নিত করে? নাকি ভুলের মাশুল দেওয়া দলীয় সদস্যরা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ভুলের দায় ঝেড়ে ফেলে? আমেরিকা ছাড়াও মাওবাদীদের পিছনে মদত আসে চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে। এর মধ্যে 'বাংলাদেশ'-এর নামটিতে অনেকেই চমকে উঠতে পারেন। ফেব্রুয়ারি, ২০১২-র 'লাল তারা' সংখ্যাটি ঘাঁটলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে। পুব বাঙ্গলার সর্বহারা পার্টি 'মাওবাদী একতা গ্রুপ'-এর তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মুখপত্র এটি। লক্ষণীয় বিষয় যে, ২০০৮-২০১০-এ পশ্চিমবঙ্গে যখন মাওবাদ টগবগ করছে, তখন তার সমান্তরালে বাংলাদেশে গঠিত হয় মাও একতা গোষ্ঠী। এই দলের নেতা শোভন রহমান ১৫ আগস্ট, ২০১১, মাওবাদী কমরেডদের প্রতি একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'নিজেদের সংশোধন করুন (সেইসব পার্টির প্রতি যারা নেপালের সংশোধনবাদী লাইনকে উর্ধ্বে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গোল্লায় যেতে সাহায্য করেছেন)। তাই আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনারা কি দু'য়ে মিলে এক হওয়ার সেই একই সংশোধনবাদী পথে হাঁটছেন না? সুতরাং, সংশোধনবাদকে খণ্ডন ও সামগ্রিক বর্জন করা ব্যতীত কোনো নয়া রিম (দ্য রেভোলিউশনারি ইন্টারন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট) ও কমপোসা (কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ মাওয়িস্ট পার্টিজ্ অ্যান্ড অর্গানাইজেশনস্ অফ সাউথ এশিয়া) হতে পারে না। তাই মধ্যপন্থা নিপাত যাক! সুবিধাবাদ নিপাত যাক!...'

তো সংক্ষেপে এটাই হলো মাওবাদ ধ্বংসের মূল কারণ--- 'সুবিধাবাদ'। এক-একজন মাওবাদী নেতা হলো সুবিধাবাদীর এক-একটি খাস মডেল। জঙ্গুলে মাওবাদীদের বিপ্লব তাই আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিল। কিন্তু মগজধোলাইয়ের দাওয়াই খেয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়ের দল চিৎকার করছে— 'হর ঘরসে হিদমা নিকলেগা...'। তাদের হাতে ধরা পোস্টার-ফ্লেক্সে— ব্রিটিশ- বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, জনজাতি বীর যোদ্ধা ভগবান বীরসা মুণ্ডার সঙ্গে বিপথগামী, মাওবাদী সন্ত্রাসী হিদমা'র তুলনা পর্যন্ত করা হয়েছে। সংগঠিত প্রক্রিয়ায় 'হিদমা' তৈরির পথ আর নেই মাওবাদীদের।

নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে হিদমা'র মৃত্যুর পর অজ্ঞ বিপ্লবীদের স্লোগান-পোস্টারে তার অপমৃত্যু ঘটেছে আরেকবার।

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী-মাওবাদী বামপন্থী দলগুলি ভারতীয় গণতান্ত্রিক বিচারধারার বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতি মুহূর্তে চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দেয়। রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক চেতনাকে সর্বতোভাবে বর্জন করে দেশের জনতার সঙ্গে তারা সচেতনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে। বাম-অতিবাম কমিউনিস্টরা যখন বিশ্ববিপ্লবে ফেল করল, তখন কোন জাদুবলে মাওবাদ ভারতে টিকে থাকে? সেই অর্থে মাওবাদের কোনো রাজনৈতিক দর্শন বা তত্ত্বগত ভিত্তিই নেই। দেশজুড়ে 'অ্যানার্কি' বা চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টিই মাওবাদীদের মূল উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থতার কারণেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে 'আপোশ'-এর বড়ো ভূমিকা। তাই স্বাভাবিকভাবেই মাওবাদীদের আজ ধরা দিতেই হচ্ছে। আপোশের এই রাজনীতির ব্যাখ্যা হাজির করতে গিয়ে ২০০৬-এ বাংলাদেশের মাওবাদী একতা গ্রুপ-ই উল্লেখ করেছে— 'সুবিধাবাদী বিলোপবাদী' তত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মাওবাদীদের এই নিদারুণ দশা দেখে বা আঁচ করেই কি অতদিন আগে মুখপত্রটির পক্ষ থেকে ওই সংখ্যার প্রকাশ?

ভারতীয় রাজনীতিতে বাম ও অতিবামপন্থা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আজকে যারা প্রকাশ্যে স্লোগান ঠুকে বলে— আরও হিদমা'র জন্ম হবে, তারা রসদ পাচ্ছে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শক্তির থেকে। বেশ কিছু বছর আগে প্রাক্তন মাওবাদী কমান্ডার শাম্বালা রবিন্দর তেলেঙ্গানার থামবালাপল্লের বাড়িতে বসে বলেন যে, সংগঠনের শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। তিনি সেদিন বলেন— ১৯৪৯-এর চীন বিপ্লবের অনুকরণে এখন ভারতে কীভাবে বিপ্লব হবে? তিনি দলের নীতি পরিবর্তনের কথা বলেন। মাও বলেছিলেন, 'যত অত্যাচার হবে, সংগঠন তত মজবুত হবে।' অত্যাচারিত হননি বটে তারা কেউই, কিন্তু গরিব জনজাতিদের ওপর অত্যাচার করতে করতে মাওবাদী কমান্ডার রবিন্দরও কিন্তু ক্লান্ত হয়ে ২০১৪ সালে আত্মসমর্পণ করলেন। ব্যক্তিহত্যা ও লাগামহীন সন্ত্রাসের বিকৃত আদর্শনির্ভর আন্দোলন কতদিন মানুষকে ত্রস্ত রাখতে পারে? সর্বাধিক কতজনকে প্রভাবিত করতে পারে? এর প্রভাব সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী বলেই দাগি মাওবাদীদেরও আত্মসমর্পণটাই করতে হয়। এ যেন ক্লান্তির আত্মসমর্পণ! সত্যিকারের বিপ্লবী হলে তারা হয়তো পরাজিত হতো, কিন্তু ব্যর্থ হতো না। ঢাকা ভারতের মাওবাদ ও মাওবাদীদের বিষয়ে বিশেষ সচেতন।

ভারত বিদ্বেষের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি প্রধান— সেই সব ব্যাপারে তারা সচেতন শুধু নয়, সরবরাহকারী বা মদতদাতাও। আল-জাজিরা ও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের সুর এক হওয়ার অর্থ এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপকতর বাম-জেহাদি রসায়ন। আল জাজিরার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বাংলাদেশে পরিবেশিত হয়ে চলেছে মাওবাদ খতমের লক্ষ্যে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান— অপারেশন জিরো বা 'কাগার'-সংক্রান্ত নানা সংবাদ। আল জাজিরা যেমন বলছে তেমনই বলে চলেছে বাংলাদেশ। সেখানে মাওবাদীদের বলা হচ্ছে 'রিবেল' বা বিদ্রোহী; সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে— 'সেনার ফেক এনকাউন্টারে প্রান্তিক উপজাতি মানুষের মৃত্যু...'। এই ধরনের ন্যারেটিভ (বিমর্শ) খাওয়াতেই হবে আল জাজিরাকে এবং এই বিকৃত বিমর্শ ধার নিতে হবে বাংলাদেশকে। মাওবাদী নেতা বাসবরাজের 'এনকাউন্টার'-এর প্রতিবাদে বাংলাদেশে জনসভা আয়োজিত হয়। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। বস্তার অঞ্চলের আয়তন বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি-র সঙ্গে তার তুলনা করে আল জাজিরা।

বিকৃত বিমর্শ তৈরি এবং তা পরিবেশনের মাধ্যমে এও এক চক্রান্ত। এই ধরনের বিমর্শ কীভাবে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তা নির্ধারণে নিত্যনতুন কৌশলও নিচ্ছে বাম-জেহাদি লবি। মাওবাদ টুকটাক অত্যাচার করলেও, তাদের ওপর ভারতীয় সেনা আরও বেশি অত্যাচার করছে— এটাই হলো বামপন্থা ও বাংলাদেশি মোল্লাবাদের মিলিত ন্যারেটিভ। এই ধরনের বিকৃত বিমর্শ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কয়েকটি তথ্যগত

পরিবর্তন ঘটায় বাম-জেহাদি ইকোসিস্টেম। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর 'মাওবাদী দমন অভিযান'কে তারা জনজাতি সমাজের ওপর ভারতীয় সেনার নির্যাতন হিসেবে বর্ণনা করে। ২০০৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম উল্লেখ করেন যে, ভারতের মাওবাদীরা বাংলাদেশের থেকে চোরাই অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, এদের বিপ্লবের রসদ আসে স্মাগলিঙের মাধ্যমে, চোরাপথে।

লাল বিপ্লব কিন্তু মাথা বিকিয়ে বসে রয়েছে পাকিস্তান মজদুর কিষাণ পার্টির কাছেও। এই বছর মে মাসে ভারতে যখন মাওবাদী কমান্ডার, ক্যাডাররা জখম হচ্ছে, আত্মসমর্পণ করছে, ঠিক তখনই পাকিস্তানি সংবাদপত্র 'জমহুর'-এ প্রকাশিত হলো একটি প্রতিবেদন। প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে তারা বলে

যে, '৬০-'৭০-এর দশকের মতো সশস্ত্র, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশন আজও প্রাসঙ্গিক। তারা এও বলে যে, মাওয়ের দেখানো পথটাই যথাযথ বিপ্লব এবং তা মুক্তি, সাম্য আনতে পারে। ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ উল্লেখ করেন যে, ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অনুসারে ওই বছরই ২৫০০ কোটি টাকার ফান্ড পায় মাওবাদী সংগঠন। এমনতো নয় শুধুমাত্র গরিবদের থেকে জবরদস্তি চাঁদা আদায় বা স্থানীয় বুর্জোয়াদের ঘাড় মটকে এই পরিমাণ অর্থের জোগাড় হয়। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানি, ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ এবং হাজার হাজার ক্যাডারদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নিশ্চিতভাবে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে হয় না। সেই সময় ২৫০০ কোটি টাকার সিংহভাগ ছিল চীন প্রদত্ত, যা পাকিস্তান হয়ে ঘুরপথে ভারতের মাওবাদীদের হাতে আসে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়।

২০১১-১২-তে পাকিস্তান-বাংলাদেশের যা সুর ছিল, ভারতে আজ মাওবাদীদের গাঢ় লাল রং ফিকে হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেখা যাচ্ছে একই বা আরও বেশি প্রতিক্রিয়া। দিল্লির রাস্তায় হিদমা'কে 'হিরো' সাজিয়ে যারা স্লোগান দেয়, তারা মাওবাদকে রোমান্টিসাইজ করছে—এমন ভাবলে তা হবে এক অতি সরলীকরণ। তারা যদি অ্যাসল্ট রাইফেল বা AK- 47 নাও ধরে, তারা কিন্তু হৃদয়-মস্তিষ্ক দিয়ে বিশ্বাস করে, 'বন্দুকের নল-ই ক্ষমতার উৎস'। '৬০-এর দশকের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে প্রচারিত মাওবাদের মূল ভিত্তি হলো 'কালচারাল মার্ক্সিজম'। 'মাওবাদ' যে একটি সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারা, তার অতীত যে ভয়াবহ, তা এইসব শহুরে, শিক্ষিতরা জানে। তাই যারা হিদমা'কে 'হিরো' বলে, তারাই প্যালেস্তাইনকে 'পবিত্র ভূমি' বলে দাবি করে। তারাই হামাস জঙ্গিদের 'সাহসী, আত্মত্যাগী যোদ্ধা' বলে। সেই তারাই আফজলের ফাঁসিতে কাঁদে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মুভমেন্ট (আন্দোলন) যে তার মুভমেন্ট (গতিপ্রকৃতি) অনেক বদলে ফেলল তা হয়তো এই কমরেডরা আর খেয়াল করেনি।

'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠাই যদি লক্ষ্য হবে, তাহলে গ্রামাঞ্চল, বনাঞ্চলের মানুষের ওপর এই সন্ত্রাস ও ভীতিসঞ্চার কেন? স্লোগান দিয়ে যারা দিল্লির আকাশ-বাতাস মুখরিত করল, তারা কেন রাজপথ ছেড়ে বস্তার জঙ্গলে থাকে না? আর বস্তারের ছেলেটা কেন রাজপথে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটে না? এই দলীয় অসাম্যটাই যে, 'সুবিধাবাদ'। ফ্যাসিবাদের বিনাশ চাইতে গিয়ে তারা নিজেরাই যে কখন নিজেদের ক্যাডারদের সঙ্গে ফ্যাসিস্টের মতো আচরণ করছে, তা তারা বুঝতে পারল না। তাই অর্থ-সহ রসদ-সরঞ্জাম রয়েছে, রাজপথে চেঁচানোর কণ্ঠও রয়েছে। সঙ্গে অবশ্য 'ইন্টেলেকচুয়াল'ও অনেকেই রয়েছে। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাডারদের আত্মসমর্পণটা লাগামছাড়া। দলীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড়ো অন্তর্ঘাত আর কিছুই হয় না। মাওবাদী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিবাদ নির্মূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পূর্ণ বিষবৃক্ষটিও ধীরে ধীরে একদিন নির্জীব হয়ে পড়বে। এটাও লাল অক্ষরে লেখা থাকবে যে, আত্মসমর্পণ করল 'মাওবাদ'। যে সংগঠন রাষ্ট্রচরিত্র গঠন করতে পারে না, রাষ্ট্রনির্মাণ করতে পারে না, রসদের অপচয়ে স্ট্রিট স্লোগানেই তারা আগামীর পথ হারায়।

৩০০ মাওবাদীর অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ

ফ ঃ ৪

পাঁচ লক্ষ সনাতনীর গীতাপাঠে ব্রিগেডের মাঠে সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৭ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অগণিত সনাতনীর সমাগমে, সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'। 'সনাতন সংস্কৃতি সংসদ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অসংখ্য সাধুসন্ত এবং লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে জনসমুদ্রে পরিণত হয় সমগ্র ব্রিগেড। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে তিনটি মঞ্চ নির্মিত হয়। মূল মঞ্চটির নাম হলো— 'শ্রীপার্থসারথি মঞ্চ'। এই মঞ্চে ভারতের প্রায় ১৫০ জন প্রমুখ সাধুসন্ত অবস্থান করেন। মূল মঞ্চের বাম দিকে নির্মিত হয় প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মঞ্চ এবং ডান দিকে নির্মিত হয় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য মঞ্চ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত প্রায় ২০০০ সন্ন্যাসী এই দু'টি মঞ্চে অবস্থান করেন। সকাল ৮টায় পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মন্ত্রোচ্চারণ করেন পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বেদপাঠের পর সমবেত কণ্ঠে কয়েকটি ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক সংগীত। সকাল ৯টায় রেড রোড-স্থিত ব্রিগেড ময়দানে মূল প্রবেশদ্বার থেকে মূল মঞ্চ পর্যন্ত একটি ভব্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়।

শোভাযাত্রার মাধ্যমে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'কে অনুষ্ঠানমঞ্চে নিয়ে এসে স্থাপনা করা হয়। সনাতনী পরম্পরায় হরিনাম সংকীর্তন-সহ ধামসা-মাদল, ডঙ্কা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে পুষ্পবর্ষণের মাধ্যমে সাধুসন্তরা সম্মিলিতভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মূল মঞ্চে এনে স্থাপন করেন। গীতাকে স্থাপনের পর রীতি অনুযায়ী গীতাকে বরণ ও আরতি করা হয়। সকাল থেকেই ব্রিগেড জুড়ে ব্যাপক জনসমাগমের সাক্ষী থাকে সমগ্র কলকাতা। ঐতিহাসিক 'পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ'-এর এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন গীতা মনীষী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ। এই মহাসমাবেশে প্রমুখ সন্তদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্ভরা, বাগেশ্বরধাম সরকার শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী, অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী জিতেন্দ্রানন্দ সরস্বতী মহারাজ, ভোলা গিরি

আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী তেজসানন্দ গিরি মহারাজ এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। গীতা প্রেস, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন, কাঠিয়াবাবা আশ্রম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সাধুসন্ত-সহ বৌদ্ধ, জৈন, শিখ-সহ সকল মত-পথ এবং সব সনাতনী সম্প্রদায়ের সাধকরাও এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস। অনুষ্ঠানমঞ্চের নীচে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ও দিলীপ ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্টজন। বৌদ্ধ ও শিখপন্থের মানুষের সঙ্গে কয়েকজন মুসসমানকেও গীতাপাঠ করতে দেখা যায়। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত প্রমুখ সাধুসন্তরা তাঁদের বক্তব্য রাখেন। তাঁদের প্রবচনের পর সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র প্রথম, নবম ও অষ্টাদশ— এই তিনটি অধ্যায় পাঠ শুরু হয়। সাধুসন্তদের সঙ্গে সমবেতভাবে সকল ভক্ত ও গীতানুরাগীরা, সম্মিলিত কণ্ঠে, সমুচ্চারিতভাবে গীতাপাঠ করেন। সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠই ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ।

সনাতনী পরম্পরায় শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি-সহ এদিন সম্পন্ন হয় পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। পরিবেশিত হয় কবি কাজী নজরুল রচিত কালজয়ী গান--- 'হে পার্থসারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ'। ব্রিগেডে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য মূল মঞ্চকে কেন্দ্র করে মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকারে ২৫টি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়। যাঁরা এদিন গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, প্রতিটি প্রবেশদ্বারে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পানীয় জল ও স্বল্পাহার। সাত্ত্বিকতার প্রতীক হলো--- শ্বেতবর্ণ। পুরুষরা শুভ্রবেশে এবং মায়েরা লালপেড়ে শাড়ি পরে এদিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাটিতে বসে গীতাপাঠ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

গীতাপাঠের মূল অনুষ্ঠান শেষে কার্যক্রমে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন সনাতন সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। তাঁর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সনাতনী। মহারাজের ভাষণের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও বাংলাদেশ হতে আগত অগণিত সনাতনীর সমাগমে ব্রিগেডের মাঠে এদিন সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস।

মালদহের গাজোলে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গীতাজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মালদা জেলার গাজোলে শ্রীমতী তাপসী মণ্ডলের বাসভবনে গত ১ ডিসেম্বর সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গীতাজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজোল নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, বর্তমানে যোগগুরু নির্মল সাহা। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতভারতীর জেলা সাহিত্য প্রমুখ সমর বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক জয় সাহা, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রমুখ শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল এবং সংস্কার ভারতীর জেলা সভাপতি পরেশচন্দ্র সরকার। প্রদীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন গাজোল খণ্ডের উপাধ্যক্ষ ভাগবত রায়। গীতাজয়ন্তী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জেলা সাহিত্য প্রমুখ সমর বিশ্বাস এবং নির্মল সাহা। সংস্কৃতভারতীর কাজের গুরুত্ব এবং এই কাজে সকলের সহযোগিতা ও সমর্পণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতভারতীর প্রান্ত সম্পাদক জয় সাহা। অনুষ্ঠানে সকলেই সংস্কৃতমাতা ও গীতামাতার চরণে নিধি ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। উত্তরবঙ্গ সংস্কৃত প্রশিক্ষণ প্রমুখ শ্রীমতী তাপসী মণ্ডল জানান, গাজোল কার্যালয়ে প্রতি মাসে ১ থেকে ১০ তারিখ নিঃশুল্ক দু'ঘণ্টা সংস্কৃতে কথা বলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে প্রণবকন্যা সঙ্ঘে নবান্ন উদ্‌যাপন

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের উদ্যোগে গত ৩০ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হৃদয়পুর প্রণবকন্যা সঙ্ঘে নবান্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ৪০জন আশ্রমকন্যা, আশ্রমকর্মী, শিক্ষিকা, সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তমণ্ডলী এবং দেশের মাটি কল্যাণ সঙ্ঘের সদস্য-সহ মোট ৮০ জন প্রীতিভোজে মিলিত হন। এই উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে আশ্রম বালিকারা সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র পাঠ এবং সমবেত সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে মনোজ্ঞ করে তোলে। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী রূপালী বর্মন। আশীর্বচন দান করেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসিনী আত্মস্থানন্দময়ী মাতাজী। নবান্ন উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন মহিষাদল গার্লস কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ ডঃ উৎপল উথাসনী। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, আইআইটি খড়্গপুরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ গৌতম কুণ্ডু এবং দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের কার্যকর্তারা।

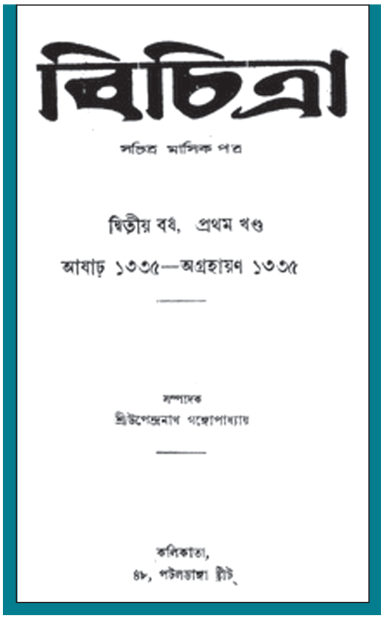
বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড

আষাঢ় ১৩৩৫—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা,

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্

হারানো পত্রিকা—তিন

এক অভিজাত পত্রিকা বিচিত্রা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

শুরুরও একটা শুরু থাকে। যেমন রান্নার আগে থাকে বাজার করা অথবা চাষ করার আগে জমি তৈরি করা। সেই সময়ের সাড়া জাগানো মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'-র আত্মপ্রকাশের পেছনেও রয়েছে এমনই কিছু উদ্যোগ— প্রস্তুতির কিছু ইতিহাস।

'বিচিত্রা'-র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন ভাগলপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর বৈবাহিক যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ধনী, কয়লাখনি মালিক। উপেন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দিলেন তিনি। সে মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথ রাজি হলেন না। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই যোগীন্দ্রনাথ হঠাৎ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা প্রয়াত পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য আবার যখন পত্রিকা বের করার কথা বলল, তখন আর অরাজি হতে পারলেন না উপেন্দ্রনাথ। শুরু হলো পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগপর্ব।

এসব ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের একবারে গোড়ার কথা। অল্প হলেও চালু রয়েছে তখন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, সবুজ পত্র-র মতো বিখ্যাত পত্রিকা। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য লেখক তালিকা যে বেশ জোরদার করার দরকার, তা বুঝেছিলেন উপেন্দ্রনাথ এবং পত্রিকার পরিচালকরা। তাঁরা ঠিক করলেন, প্রথম থেকেই পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে বাংলা সাহিত্যের সূর্য-চন্দ্র— রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখা। সেই মতো শুরু হলো যোগাযোগ।

তার আগে অবশ্য নাম ঠিক করার পালা। গোটা কুড়ি নাম নিয়ে নাড়াচাড়ার পর দুটি নামে স্থির হওয়া— সবিতা ও হিমালয়। তারই একটিতে পড়বে সিলমোহর এমনই ইচ্ছা। আর এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতামত নেওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল মনে এবং সেই বাসনা নিয়েই শান্তিনিকেতন যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনবাসী। তাই উপেন্দ্রনাথ হাজির হলেন সেখানে। শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ ভাগলপুরেরই প্রেমসুন্দর বসু হলেন মধ্যস্থ। রবীন্দ্রনাথ কথাবার্তার মধ্যে জানতে চাইলেন— তখনও অজাতক পত্রিকার নাম। উপেন্দ্রনাথ জানান, কয়েকটি নামের মধ্যে পছন্দ 'সবিতা' নামটি।

রবীন্দ্রনাথ সায় দেন নামে। বলেন, বেশ ভালোই নাম। তখনই প্রেমসুন্দর বসু বলেন, আরও একটি নাম ভেবেছে ও —'হিমালয়।' শুনেই 'কুঞ্চিতস্মিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সবিতা' অথবা 'হিমালয়'? না:, তোমার পছন্দ যে উঁচুস্তরের, তা স্বীকার করতেই হলো।

কবির এই সরস বাক্যভঙ্গীতে খুশি হয়ে প্রেমবাবু আর আমি হাসতে লাগলাম।' (উপেন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতিকথা (৪র্থ), পৃ. ৪২)।

যাইহোক, উপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ফিরলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ পাওয়ার অকৃপণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

এবার যাত্রা হাওড়ার সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রর কাছে। সম্পর্কে শরৎচেন্দ্রর মামা হলেন উপেন্দ্রনাথ। তাই লেখা পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়েই গিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ। কিন্তু এক অদ্ভুত কারণে শরৎচন্দ্র লেখা দিতে রাজি হলেন না। এক ধরনের অভিমান আর জেদ নিয়ে প্রায় ধুলোপায়েই ফিরে যান উপেন্দ্রনাথ।

'সেদিন কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কাগজ যদি বার করতে পারি তো খুঁজে পেতে অখ্যাত শক্তিশালী লেখক বার করব; যদি প্রয়োজন হয়, তাদের দ্বারস্থও হব; কিন্তু প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের দ্বারে সাধ্যমতো আর নয়।' (ওই, পৃ. ৫৭)।

শরৎচন্দ্রকে বাদ রেখেই নতুন পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি চালাতে থাকেন উপেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীরা। পত্রিকা প্রকাশ পর্বের আগে সবচেয়ে বড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো নামকরণের ক্ষেত্রে। সবিতা নয়, হিমালয়ও নয়, এমনকী আগে যেসব নাম ভাবা হয়েছিল সেগুলিও নয়। প্রায় আচমকাই পত্রিকার নাম রাখা হলো 'বিচিত্রা'। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা ক্লাবের কথা মাথায় রেখে।

এই নামকরণ অথবা নাম বদল যাই বলা হোক না কেন, করা হলো একটি বিশেষ কথা মাথায় রেখে। শরৎচন্দ্রকে বাদ রেখে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভরসার জায়গা রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গের মানুষ সব সময়ই রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ার জন্য একরকম মুখিয়ে থাকত। তাই তাঁর লেখা যাতে কোনো মতেই বাদ না যায় অথবা বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ যাতে কোনোভাবেই বঞ্চিত না করেন তারই জন্য ওই 'বিচিত্রা' নামকরণ। 'বিচিত্রা'-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক যোগ অথবা দুর্বলতার কারণে এবং বিশেষভাবে তাঁর সহানুভূতি পাওয়ার কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেন উপেন্দ্রনাথরা, এই অনুমান করা যেতেই পারে।

কোলিয়ারি মালিক যোগেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই আশা পূরণের জন্য পত্রিকায় সম্পাদক হতে রাজি হলেন উপেন্দ্রনাথ। এবং 'মাসিকপত্র' প্রকাশ করা স্থির হওয়ামাত্র আমার নিরবসর ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা হলো, কী করে সে পত্রকে অনন্যসাধারণ করে তোলা যাবে? ...আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাংলাদেশের প্রথম কাগজ না করতে পারি, অন্তত প্রথম শ্রেণীর করতেই হবে।' (ওই, পৃ. ৩৯)।

উপেন্দ্রনাথের এই আশার প্রতিধ্বনি শোনা গেল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় অমল হোমের লেখা 'আমাদের কথা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে,— 'বিচিত্রার যাত্রারম্ভ হলো আজ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে— মন্দাক্রান্তা ছন্দে। অসঙ্কলিত সহজ-সৌভাগ্যে এর গতি অভিসূচিত হয়েছে ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের বিচিত্র নৃত্যলীলা। আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, গ্রীষ্মের অগ্নিকণা, বর্ষার জলবিন্দু, শরতের নির্মলতা, হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, শীতের নিবিড়তা এবং বসন্তের পুষ্পোৎসব 'বিচিত্রা'কে বর্ষে বর্ষে বিচিত্র করুক।'

'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' আষাঢ়ের বজ্রনির্ঘোষে 'বিচিত্রা'-র আবির্ভাব অনেকটাই বাদশাহি দরবারের কেতায়। নকিবের আগাম উচ্চররের মতোই আষাঢ়ের বহু আগে 'বিচিত্রা'-র আগমন বার্তা জানিয়ে শহর ছেয়ে গেল বিজ্ঞাপনে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়, '...'বিচিত্রা'-র মতো উঁচুকপালে পত্রিকা— যার শুনেছি, বিজ্ঞাপনের পোস্টার শহরের দেয়ালে ঠিক-ঠিক লাগানো হয়েছে কিনা দেখবার জন্যেই ট্যাক্সি ভাড়া লেগেছিল একটা স্ফীতকার অঙ্ক।' (কল্লোলযুগ, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

মাসিক 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হলো উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর দুই সহযোগী অমল হোম আর কান্তিচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায়। প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটিই রবীন্দ্রনাথের। বিবরণ উপেন্দ্রনাথের 'স্মৃতিকথা'-র চতুর্থ খণ্ডে 'প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'বিচিত্রা'-র জন্য বিশেষভাবে রচিত 'বিচিত্রা' নামক চার পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা— কবির হস্তলিপিতে মুদ্রিত; তারপরে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের চৌষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী অপরূপ খণ্ডকাব্য 'নটরাজ— ঋতুরঙ্গশালা' এবং তৎপরে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ 'নতুন ও পুরানোর ছন্দ'; স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'ইতিহাস'; সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ 'পূর্ব ও পশ্চিম'; ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ 'ইন্দো-চীন ভ্রমণ'; রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোটোগল্প 'ভৌতিক প্রেম', ডক্টর শিশির কুমার মিত্রের সচিত্র প্রবন্ধ 'বেতার বার্তা'; ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর উপন্যাস 'সতী'; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নটরাজের স্বরলিপি; এবং আরও অনেক।' (পৃ. ১০৭)।

চারুচন্দ্র রায়ের বহুবর্ণ প্রচ্ছদে মোড়া পত্রিকায় ছিল অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজনের রঙিন ছবি। সব মিলিয়ে রীতিমতো অভিজাত একটি পত্রিকা।

'বিচিত্রা'-র এই রাজকীয় আবির্ভাব সম্পর্কে 'আত্মস্মৃতি'-তে সজনীকান্ত দাসের কিছুটা তির্যক মন্তব্য,— '১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে বাংলা সাহিত্য সরোবর তোলপাড় করিয়া মহাসমারোহে ষড়ঋতুর কানামাছি খেলার নৃত্য ছন্দে বিচিত্রা আবির্ভূত হইল। কান্তিচন্দ্র ঘোষ তবলা ও অমল হোম বাঁয়া সঙ্গত করিয়া এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সানাইয়ের পোঁ ধরিয়া এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করিলেন যে, মনে হইল দীনবন্ধুর 'দীনাহীনা- পিঁচুটি-নয়না' বঙ্গবাণী অকস্মাৎ পাটরানি পদে বৃতা হইলেন এবং রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি রকমে এই কানামাছি খেলার বুড়ি হইয়া বসিলেন। কলিকাতার পথঘাট, প্রাচীন ও প্রান্তর 'বিচিত্রা'-র বিচিত্র, বিজ্ঞাপনী কলরবে মুখর হইয়া উঠিল।

সাহিত্যে 'অভিজাত' কথাটা সেই প্রথম শুনিলাম। বস্তুত বাংলা মাসিক পত্রের এক বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত 'বিচিত্রা' আনিয়া দিল।' (পৃ. ১৭৫)।

আবির্ভাবেই 'বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত' দেয় বিচিত্রা। বৈচিত্র্যে পত্রিকার প্রথম শ্রেণীর লেখকরা, তার পরিপাট্য, নাগরিক রুচির সুষম ব্যবহার, লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের নানা চিত্র এবং রেখাঙ্কন পত্রিকাটির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে।

একথা সত্য, সাহিত্য পত্রিকা হলেও এই পত্রিকার রচনাগুলিতে কোনো নতুন চরিত্রের প্রকাশ ছিল না। সে সময় 'কল্লোল' অথবা 'প্রগতি' পত্রিকায় ভিন্ন ধারার আন্দোলন গড়ে তোলার সক্রিয় প্রয়াস থাকলেও, 'বিচিত্রা'য় সে ধরনের কোনো চেষ্টা ছিল না। বরং পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনার ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। সে কারণে পত্রিকাটির সামগ্রিক মান ছিল অত্যন্ত উন্নত।

'বিচিত্রা'য় সাহিত্যিকদের নামের সঙ্গে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলি উল্লেখ করা হতো। অবশ্য সেকালের বেশিরভাগ পত্রিকাই লেখকদের যোগ্যতা প্রকাশ করে একধরনের বাড়তি গুরুত্ব আদায়ে সচেষ্ট থাকত। 'বিচিত্রা'-র বেশিরভাগ লেখক-লেখিকা তাঁদের রচনার গুণগত মানের জন্যই পাঠকদের হৃদয় জয় করেন। তবুও এক্ষেত্রে চলতি হাওয়ারই পন্থী ছিল পত্রিকাটি। অর্থাৎ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আশাতেই লেখকদের ডিগ্রিসমন্বিত নাম শোভা পেত পত্রিকায়।

শরৎচন্দ্রর কোনো লেখা ছাড়াই 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয় প্রথম বছর চার। অন্যের কান ভাঙানিতে বিশ্বাস করেই শরৎচন্দ্র 'বিচিত্রা'য় লেখা দিতে রাজি হননি। কিন্তু পরে শরৎচন্দ্র জানতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। ওই ব্যক্তি তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। এটা জানার পর তিনি নিজেই উপেন্দ্রনাথকে ফোন করে লেখা দিতে চান। সেইমতো 'বিচিত্রা'-য় ঘোষণা করা হয়, ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে শরৎচন্দ্রর শ্রীকান্ত-র চতুর্থ পর্ব ধারাবাহিকভাবে। শ্রীকান্ত চতুর্থপর্ব 'বিচিত্রা'-য় প্রকাশিত হয়

১৩৩৮-এর মাঘ থেকে ১৩৩৯-এর মাঘ পর্যন্ত। এরপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রর 'বিপ্রদাস' ফাল্গুন ১৩৩৯ থেকে মাঘ ১৩৪১ পর্যন্ত।

একথা বলতেই হয়, 'বিচিত্রা' প্রথম থেকেই ছিল রবীন্দ্রময়। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'যোগাযোগ', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন' ছাড়াও 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'শিশুতীর্থ' ইত্যাদি। এছাড়া লিখেছেন আরও বহু বহু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র। 'বিচিত্রা'-র জন্য অকৃপণ ভাবে লেখা দেওয়ার কারণে তখনকার অনান্য পত্রিকাগুলি অভিযোগ করতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওরা আমাকে কিনে নিয়েছে'। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় 'বিচিত্রা'র এক যুগের জীবনকালে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রবিষয়ক ১২২টি লেখা। এরমধ্যে ১৯টি লেখার উপজীব্য ছিল কেবলই রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ সংখ্যা— ১৩৩৮-এর আশ্বিন মাসে— রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহাররঞ্জন রায়, সরসীলাল সরকার, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, হরিদাস হালদার প্রমুখ বিশিষ্টজনরা।

'বিচিত্রা' একটি সাহিত্য পত্রিকা। বাংলা সাহিত্যে কোনো নবগঙ্গার খাত তৈরির ভগীরথ হওয়ার কোনো আকাশছোঁয়া বাসনা ছিল না পত্রিকা পরিচালকদের। কোনো সময় কোনো ভাবেই তেমন সংকল্পের ইঙ্গিতমাত্র দেননি তাঁরা। বরং বিভিন্ন সময় তাঁরা বাংলার সাহিত্য রসিকদের একটি শোভন, সুন্দর, মার্জিত রুচির পত্রিকা উপহার দেওয়ার কথাই উচ্চারণ করেছে 'বিচিত্রা'। এক যুগের জীবনকালে 'বিচিত্রা' সেই ঘোষণারই বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অন্যান্য বেশ কিছু নতুন-পুরনো কাগজের মতো নিজস্ব একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরির দিকে কখনোই নজর দেয়নি। কেবল তাই নয়, 'বিচিত্রা'-কে কোনো সময়ই লেখক তৈরির চেষ্টাও করেনি। পত্রিকায় আগাগোড়া প্রাধান্য

দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠিত লেখকদেরই। তা বলে নবীন লেখকদের তাঁরা অবহেলা করেছেন এমন অভিযোগ করা যায় না। বরং বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর দুজন— বিভূতিভূষণ ও মাণিক বস্তুত 'বিচিত্রা'-রই আবিষ্কার।

ভাগলপুরে চাকরি করার সময়ই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। এর আগে তাঁর প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যায়। তাই উপন্যাসটিও পাঠিয়েছিলেন সেখানেই। কিন্তু 'প্রবাসী' ফেরত পাঠিয়ে দেয় সেটি। বিভূতিভূষণের মুখে 'পথের পাঁচালী'র কথা শুনে উপেন্দ্রনাথ সাগ্রহে চেয়ে নেন সেটি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'বিচিত্রা'-র দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতেই সাড়া পড়ে যায় পাঠকমহলে। ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান বিভূতিভূষণ।

একই ভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী' গল্পটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেন উপেন্দ্রনাথ। মানিকও প্রতিষ্ঠা পান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনো নতুন দিশা দেখায়নি 'বিচিত্রা', একথা সার্বিকভাবে সত্য। কিন্তু পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা বেশ কিছু বৈশিষ্টের স্বাক্ষর রাখে। প্রথমত, এই পত্রিকায় যেসব লেখকের রচনা প্রকাশিত হয়, তাঁদের প্রত্যেককেই কিছু না কিছু পরিমাণ দক্ষিণা দেওয়া হতো। একবারে নবীন থেকে প্রবীণ সকলেই লেখার জন্য দক্ষিণা পেতেন। এটা তৎকালীন পত্রপত্রিকার জগতে একটা বিপ্লব বলেই মনে করা হয়।

গুণমানে উত্তীর্ণ লেখাই প্রকাশিত হতো 'বিচিত্রা'-য়। এক্ষেত্রে কোনো গোষ্ঠী বা অন্য কিছুকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। একই সঙ্গে এই পত্রিকায় চিত্র ও অলংকরণ অত্যন্ত গুরুত্ব পেত। চিত্রশিল্পীদের সাহিত্যিকদের মতোই সমান সম্মান ছিল পত্রিকা- পরিচালকদের কাছে। এ সম্পর্কে 'বিচিত্রা'-র সাব এডিটর বিশিষ্ট লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মন্তব্য— 'সজ্জা শোভা' ও কারুকার্যের দিকে 'বিচিত্রা'-র বিশেষ ঝোঁক ছিল। এককে সময় ছবির জমকে লেখা কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, মনে হতো লেখার চেয়ে ছবিরই বেশি মর্যাদা— অন্তশ্চক্ষুর চাইতে চর্মচক্ষুর।' (কল্লোল যুগ, পৃ. ১৮৪)।

'বিচিত্রা'-র লেখককুল ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ, জসিমুদ্দিন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, হুমায়ুন কবির, মোহিতলাল মজুমদার, অমিয় চক্রবর্তী, রাধারানি দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রমুখ সেকালের প্রায় সাহিত্যিকই ছিলেন 'বিচিত্রা'-র লেখক। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসগুলিও ছিল পত্রিকার সম্পদ।

ব্যক্তিগতভাবে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, মুক্তমনা সাহিত্য রসিক। লেখার মানই ছিল তাঁর কাছে একমাত্র বিবেচ্য— লেখকের ধর্ম নয়। তাই তাঁর স্পষ্ট ভাষণ— '...'বিচিত্রা'-র প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে একইভাবে সুগম করেছিলাম এবং একই প্রকারে উন্মুক্ত করেছিলাম।' (স্মৃতিকথা (৪র্থ) পৃ. ৭১)।

সব মিলিয়ে কোনো ধরনের আন্দোলনের শরিক না হয়েও এক যুগের জীবনকালে (১৯২৭-১৯৩৯ খ্রি.) সুস্থ, শোভন, অভিজাত ও রমণীয় সাহিত্যচর্চার এক অনিন্দ্যসুন্দর নিদর্শন রেখেছে 'বিচিত্রা' এবং সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পবিত্র রণক্ষেত্র বুড়িবালামের তীর

প্রদীপ মারিক

জার্মানি তখন ইংরেজদের প্রধান শত্রু। জার্মানি থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রচারকার্য চালানোর জন্য 'বার্লিন কমিটি' তৈরি করলেন সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় ছাত্ররা। এদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ সালে অবনী মুখার্জিকে জাপানে পাঠিয়ে দিলেন রাসবিহারী বসুর কাছে। এদিকে 'আত্মোন্নতি সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির সাহায্যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট কলকাতার ধর্মতলায় 'রডা অ্যান্ড কোম্পানি'-র দোকান থেকে বিপ্লবীরা ৫০টি মাউজার পিস্তল ও ৪৬০০ রাউন্ড কার্তুজ লুঠ করেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। যতীন্দ্রনাথ চেষ্টা করছিলেন জার্মানির কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিপ্লবী যোগাযোগ করেন জার্মান সরকারের সঙ্গে। জার্মান প্রশাসন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল।

যতীন্দ্রনাথের সহযোদ্ধা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্র আনতে সিআর মার্টিন নাম নিয়ে বাটাভিয়া যান। সেখানে জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন জার্মানির প্রশাসনের সঙ্গে। তাকে জার্মান সরকার জানায়, অস্ত্র বোঝাই ৩টে জাহাজ ভারতের উপকূলে পাঠাবে তারা। সেই অনুযায়ী, ম্যাভেরিক, অ্যানি লার্সেন ও হেনরি-এস নামে তিনটে জাহাজ রওনা দেয়। বহু কাঙ্ক্ষিত ৩০ হাজার রাইফেল, ৪০০ রাউন্ড গোলাবারুদ আর মোটা অঙ্কের টাকা আসবে জার্মানি থেকে ওড়িশার বালাসোর উপকূলে। জাহাজ এসএস মারভিতে করে জলপথে আসবে এই বিপুল সাহায্য। এই সাহায্য আনতে ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দেশ ছাড়লেন এমএন রায়। তার দায়িত্ব ছিল এটিকে পথ দেখিয়ে বালাসোর পর্যন্ত নিয়ে আসা। পুরো পরিকল্পনা সুন্দর করে বাস্তবায়িত করার পর এমএন রায় মুম্বই ফিরে আসেন। তিনি ফিরেই একটি টেলিগ্রাম করেন যুগান্তর পার্টির এক সদস্যকে 'আমরা পৌঁছে গেছি। আজ রাতেই যাত্রা করবে বালাসোরের উদ্দেশ্যে। ওখানে আশা করি আমাদের জন্য কেউ থাকবে।' ওই টেলিগ্রামের সন্ধান পায় ব্রিটিশ গুপ্তচর। এরপর বঙ্গ, বিহার, পঞ্জাবে শুরু হয় ধরপাকড়। এরপর শুরু হয় যতীন্দ্রনাথ-সহ বিপ্লবীদের খানা তল্লাশি।

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে যতীন দেশের স্বাধীনতার জন্য আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে শুরু করেন। এসময়ে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে যতীন তার বন্ধুদের দল নিয়ে এই রোগে আক্রান্তদের সেবায় নিয়োজিত হন। এবং যতীন শরীরচর্চার জন্য অম্বু গুহের কুস্তির আখড়ায় যোগ দেন।

১৯০৩ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। সরকারি নথিপত্রে তিনি পরিচিত হন শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিণহস্ত হিসেবে। অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে তিনি শরীর গঠন আখড়ায় গাছে চড়া, সাঁতার কাটা ও বন্দুক ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সাল থেকে স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটনের সহযোগিতায় তিনি একাধিক মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এদের কাছে নির্দেশ ছিল, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক লড়াইয়ের কায়দা ও বিস্ফোরক প্রস্তুতের তালিম নিয়ে আসতে এবং বিদেশের সর্বত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করতে।

এদিকে ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে বাঘাযতীন ও তার সঙ্গী বিপ্লবীদের পিছু নিয়েছিলেন। বিপ্লবীরা অনাহারে-অর্ধাহারে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে যেতে লাগলেন। বাঘাযতীন ভীরু কাপুরুষ ছিলেন না। পালটা আক্রমণের জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। এদিকে ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী বাঘাযতীনদের দলবলকে 'ডাকাত' বলে গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছিল। তাই স্থানীয় মানুষদের কেউ কেউ ভয় পেয়ে এবং ডাকাত ধরানোর পুরস্কারের লোভে বাঘাযতীনের গতিবিধির খবর জানিয়ে দিচ্ছিল পুলিশকে।

একদিন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বুড়িবালাম নদীর তীরে দোকানে চার সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসেছিলেন বাঘাযতীন। সেই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছয়। তখনই পুলিশবাহিনী নিয়ে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি ও মিলিটারি লেফটেন্যান্ট রাদারফোর্ড চলে আসে সেখানে। বাঘাযতীনও বিপদ আঁচ করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। আশ্রয় নিলেন পরিখার আড়ালে। পুলিশের সঙ্গে তাঁদের গুলির যুদ্ধ শুরু হলো। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পবিত্র রণক্ষেত্রে পরিণত হলো বুড়িবালামের তীর। গুলির যুদ্ধে সেখানে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী বীরগতিপ্রাপ্ত হলেন। গুরুতর আহত হলেন বাকি তিন জন। তাঁদের গুলি সব হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের বাগে পেল।

পরের দিন বালেশ্বর সরকারি হাসপাতালে মারা গেলেন বাঘাযতীন। বিচারে তাঁর সঙ্গী জ্যোতিষ পালের ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের হলো ফাঁসি। বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যে ৪ বাঙ্গালি বিপ্লবী মরণপণ লড়াই করেছিলেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন, 'বাঙ্গালির রণ দেখে যা রে তোরা/রাজপুত, শিখ, মারাঠী জাঠ! /বালাশোর— বুড়িবালামের তীর— নবভারতের হলদিঘাট।' □

ব্যতিক্রমী জীবনানন্দ দাশ ‘১৯৪৬-৪৭’

অচিন্ত্য বিশ্বাস

যদি বলি জীবনানন্দ ছেচল্লিশের জেহাদি দাঙ্গার বাস্তবকে বোঝেননি, ভুল হবে। তখন তিনি ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছরের ক্রিয়াশীল কবি। দেখেছেন। হয়তো অন্যমনস্ক, কিন্তু ভুল দেখেননি। ‘পূর্বাশা’-য় প্রকাশিত ‘১৯৪৬-৪৭’ তেমনই কবিতা। একটু অগোছালো মনে হয়। তখনকার বঙ্গের, বিশেষত কলকাতার সাংস্কৃতিক রাজনীতির পরোক্ষ শাসনে তিনি লিখলেন এই দীর্ঘ কবিতাটি। একশো পঁয়ত্রিশ চরণের এই কবিতা। তেরোটি অনিয়মিত স্তবক, মিলহীন— বিচিত্র কিছু অর্ধস্ফুট প্রতীকের নির্মাণে অনালোকিত এই কবিতা। মনে হয় রাজনৈতিকভাবে সঠিক (Politically correct) থাকার ইচ্ছা এর আড়ালে থেকে গেছে। কয়েকটি প্রতীক বিশ্লেষণ করলে অন্তত তাই মনে হয়।

এগুলোকে প্রতীক বলব, চিত্রকল্প বা বাক-প্রতিমা নয়। কারণ এগুলোর মধ্য দিয়ে কবি যেতে চান তাঁর নির্বিকল্প বক্তব্যে। চিত্রকল্প এমন হয় না। সে বড়ো নিভৃতচারী নির্মাণ। দেখাই :

১. ‘কোথায় পরের বাড়ি এখুনি নিলাম হবে— মনে হয়, জলের মতো দামে।’

...

‘অনির্বচনীয় যুক্তি একজন দু-জনের হাতে। পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকেদের দাবি এসে সবই নেয়, নারীদেরও নিয়ে যায়।’

২. ‘বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল। সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার খোঁপা বেঁধে নিতে আসে— কিন্তু কার হাতে? আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে— কিন্তু কার তরে? হাত নেই— কোথাও মানুষ নেই; বাঙ্গলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন আলপনার পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।’

৩. ‘এযুগে কোথাও কোনো আলো— কোনো কান্তিময় আলো চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মানের মতো : ... ...

... ... অতীতের শুধানো প্রশ্নের উত্তর চায় না আর— শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন অন্ধকারে ঘিরে রাখে।’

এক বীভৎস দাঙ্গা, নাগরিক টানাপোড়েন আর গ্রামীণ পরিস্থিতির অভ্রান্ত অনুভূতিশীল এমন বিবরণ কল্পনাতীত। নিলাম ঘরের বা অকুস্থলের বিবরণটির ঠিকানা কলকাতা। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর পর ‘উঁচু লোকেদের’ দাবি মেনে নেওয়া কলকাতার বহু হিন্দুর সম্পত্তির হাত বদলের সংবাদ। সেই সব ‘অনির্বচনীয় হুণ্ডি’র মালিকরা ‘সবই নেয়, নারীদেরও নিয়ে যায়।’

অন্যদিকে বঙ্গের গ্রাম, লক্ষ লক্ষ গ্রাম--- নোয়াখালি-বামন বাড়িয়া-ফেনী-বরিশাল- টাঙ্গাইল- মৈমনসিংহ-শ্রীহট্ট আলোহীনতায় ডুবে গেল। ভয়ে সন্ত্রাসে ‘নিস্তব্ধ’, ‘নিস্তেল’। শব্দ হবে কেন— সবই শুনশান মৃত্যুকীর্ণ। আলোগুলি তেলের অভাবে নিবে গেছে— তাই ‘নিস্তেল’। নোয়াখালি হিন্দুহত্যা শুরু হয় ২০ অক্টোবর ১৯৪৬; কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা ছিল সেদিন। ঘরে ঘরে জ্বালানো হয় প্রদীপ। বিশেষত পূর্ববঙ্গে তাই ছিল লোকাচার। জীবনানন্দের প্রতীক তাই লক্ষ্য করেছেন, সূর্যাস্তের পর ‘কেমন সুকেশী অন্ধকার’ খোঁপা বাঁধবে যেন, কিন্তু কার হাতে? সে কি বিধর্মী অত্যাচারী বিদেশি লুণ্ঠনজীবী কেউ নয়?

হায়! যে রাত্রে লক্ষ্মীদেবী ‘কে জাগে’ বলে ঘরে ঘরে দেখা দেবেন বলে স্নিগ্ধ বিশ্বাস ছিল, সেই রাত্রে এমন শুয়োর চর্বির মতো অন্ধকার ঝুলিয়ে দিয়ে গেল কারা? কাদের জন্য ‘জয়বাংলা’ বলছেন গৌতম ঘোষ?

বিপরীতে জীবনানন্দের মনে লক্ষ্মীপূজার রাতটি যেমন হতে পারত, তারও কলম-চিত্র উপস্থিত। ‘বাংলার লক্ষ গ্রাম রাত্রি একদিন/আলপনার পটের ছবির মতো’ হতে পারত। তাদের মুখে ছিল মধুমাখা হাসি (‘সহাস্যা’

ফঃ৫

বিশেষণটি দেখুন), তাদের চোখ জোড়া যামিনী রায়ের প্রেরণা ('পটলচেরা চোখের মানুষী/হতে চেয়েছিল প্রায়') কিন্তু সব নিভে গেছে।

সুতরাং আলোর উদ্দিশ ছিল না কোনো, 'কান্তিময় আলো' ছিল অসম্ভব। চাপ চাপ অন্ধকার, ভীষ্ম সাহানীর 'তমস' যেমন। 'রাত্রির মায়ের মতো'। চিরকাল যে সব অমীমাংসিত পরিস্থিতির ব্যাখ্যা খোঁজে মানুষ— সেইসব 'শুধানো প্রশ্নের/উত্তর' চায় না 'রাত্রির মায়ের মতো' অন্ধকার। সেই চির শান্ত শব্দহীন— মৃত্যুহীন ভয়ঙ্কর অন্ধকার। জীবনানন্দ যা ১৯৪৬-৪৭-এ দেখেছিলেন। আমাদের প্রজন্মের ভুল রাজনীতির চোরাবাজার যাকে ভুলতে চায়।

কলকাতার ভয়ঙ্কর দিন রাত্রি

'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আমাদের সাহিত্যের বিষয় হয়নি। শুধু কিছু কৃত্রিম লেখা হয়েছে। দুটি গল্প মনে পড়ছে— রমেশ চন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া' আর সমরেশ বসুর 'আদাব'। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় একটি অতীব কৃত্রিম লেখা লিখেছেন নোয়াখালিতে গান্ধীজীকে নিয়ে। এক মুসলমান মেয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর মনের টান, সে গল্পের বিষয়। যেন কোথাও কিছু হয়নি। সব শান্ত, সুন্দর, মানবিক। গল্পটি আবার পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপাঠ্য বইগুলিতে পাঠ্য! বাস্তবকে কদর্যভাবে পালটে ফেলা ছাড়া এসব রচনায় আর কিছু নেই। যতটা প্রতিক্রিয়া হবার কথা ছিল, ততটা হয়নি।

নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনানন্দ কিন্তু ভোলেননি। ঘন তমিস্রার নৈঃশব্দ্য, কোজাগরী পূর্ণিমার 'নিস্তেল' প্রদীপ তাঁর চোখ এড়ায়নি। কলকাতা শহরের পরিসর তিনি মনে রেখেছেন।

১. '...গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার; মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'

২. 'এইসব মানুষ হতভাগ্য, দরিদ্র, বাঁচবার শক্তি--- ঐক্যের ভাব, সংহতি, সঙ্ঘশক্তি নেই।

...জীবনের ইতর শ্রেণীর

মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;

তবে এরা সেদিন সহসা জেগে উঠেছিল। প্রতিক্রিয়া তাকিয়েছিল।'

৩. 'সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে

এইসব প্রাণ কণা জেগেছিল বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে

সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল রশ্মিতে

সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের

মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন

উচ্ছ্বসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।'

কবি তিনি, আর কতটা লিখবেন?

ধ্বস্ত গ্রাম—মলিন সন্তানসন্ততি

গ্রাম ও শহর দুই দিকেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যু আর ভয়ংকর নারী লাঞ্ছনা দেখেছেন তিনি। ভেবেছেন, শহরে একটু দেরি হলেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে। গ্রাম দেশ? নিতান্ত শুনশান। এর কারণ তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়েছিল। বুঝেছিলেন তিনি 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' গল্প— আইপিটিএ-র মতো নয়, নিজের মতো করে। সেই গল্প সামাজিক আধিপত্যের, জমিদারি ব্যবস্থার, জাতপাতে কণ্টকিত বাস্তব। দেখাই :

১. 'এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনো পেয়েছে;

নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক

এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের

ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত;

এখন টুঁ-শব্দ নেই সেইসব কাক পাখিদেরও;'

২. 'ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো

ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগদির

ঈশ্বরী মেয়ের সাথে

বিবাহের কিছু আগে— বিবাহের কিছু পরে— সন্তানের জন্মাবার

আগে।'

অনাদর, উপেক্ষার চেয়ে বড়ো কথা এই যৌন-শোষণের ফলে সমাজের দুটি বর্গ কিন্তু মেশেনি। জীবনানন্দ লিখেছেন :

৩. '... আজকের এইসব গ্রাম্য সন্ততির

প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে— অন্ধকারে

জমিদারদের

চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।'

(আমাদের খুব ধারণা, পাঠটি হবে 'ঘুরায়ে')

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই বিকার জীবনানন্দের চোখে খুব স্পষ্ট। সিদ্ধান্ত তাঁর—

৪. 'ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না; তবুও

আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়

অঙ্গ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে

পৃথক আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল।'

সেই 'স্পষ্ট জগতের অধিবাসী' হলেও আমাদের গ্রামীণ জনতা মন্বন্তর দাঙ্গা ক্লিষ্ট অবস্থা থেকে মুক্তি পেত কি? জীবনানন্দের উত্তর নেতিবাচক।

সমবেত প্রতিরোধ—কান্তিময় আলো

সমবেত প্রতিরোধ যখন হলো, তখন জীবনানন্দ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, দেখিয়েছি। তাঁর মনে হয়েছে, এই প্রতিরোধ শহরের নিম্নবর্ণের মানুষের। তিনি তাঁদের চোখে দেখেছেন প্রত্যয়--- 'এই সব প্রাণকণা'দের 'সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল'। না, মনে হবার কারণ নেই। তবে জীবনানন্দ এঁদের নাম জানতেন না সম্ভবত। হয়তো কবিতাকে রিপোর্টাজ বানাবার বাসনাও তাঁর ছিল না। আজ যখন 'ছেচল্লিশ' নিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুর প্রতিক্রিয়াহীন আত্মসমর্পণ দেখছি, তখন এই সব মানুষকে একটু স্মরণ করা উচিত বলে মনে করি। অনেক নামই শুধু লোকমুখে প্রচলিত (আজকের সামাজিক মাধ্যমে), তবু এদের কথা প্রসঙ্গক্রমে আনা দরকার।

১. বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি; ২. সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ৩. গোপাল মুখোপাধ্যায় (বহু চর্চিত 'গোপাল পাঁঠা'); ৪. রাম চ্যাটার্জি; ৫. যুগল চন্দ্র ঘোষ; ৬. বিজয় সিংহ নাহার; ৭. বিষ্ণুচরণ ঘোষ; ৮. জে.এল ভাদুড়ি; ৯. দিলীপ রায় চৌধুরী; ১০. প্রফুল্লকান্তি ঘোষ ('শতঘোষ'); ১১. রণজিৎ সাহা; ১২. মলয়

ব্যানার্জি; ১৩. অমল দত্ত; ১৪. জগবন্ধু মিত্র; ১৫. গৌর গোস্বামী; ১৬. বিনয় ব্যানার্জি; ১৭. জগা বসু; ১৮. ভানু বসু; ১৯. মলয় সরকার; ২০. সুকুমার বসু; ২১. সুখদেও সাহা; ২২. কাজল মুখোপাধ্যায়; ২৩. গুরুপদ নন্দী; ২৪. হৃষীকেশ চৌধুরী; ২৫. নেপাল রায়; ২৬. কালী মুখার্জি; ২৭. আশুতোষ ঘোষ; ২৮. শ্যামলাল ঘোষাল। —আরও অনেকে ছিলেন।

তাঁরা রাজনৈতিকভাবে সঠিক ছিলেন কি? জীবনানন্দ এই কবিতায় যে বিষয়ে সামান্য ভেবেছেন। তাঁর মতে এ ছিল মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কোনো কোনো সময় মানুষকে জন্তু হতে হয়। কারণ প্রতিপক্ষ তো আরও ভয়ংকর জন্তু। হরিণ আর বাঘ যেমন। জীবনানন্দ লিখছেন—

১. '... ... প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল

ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে,

দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল

হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায়;'

এই রকম মৃত্যু জেহাদের নামে, রাজনীতির নামে চলে আসছে।

এই স্তবকের একটি চরণ বামপন্থীরা বিখ্যাত করেছেন। আগে পরে কী আছে, সেদিকে দৃষ্টি ফেলেননি। ওরা এরকমই। চরণটি এই রকম :

২. 'মানুষ মেরেছি আমি— তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে;'

আসলে নিজেকে নিহত ভ্রাতার ভাই বলে শনাক্ত করছেন কবি, অথচ এর অন্যদিকে বিশ্বমানবতা নেই, ধর্মোন্মাদ ছাড়া কিছু নেই।

৩. '...আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু

হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল; আমি রক্তাক্ত নদীর

কল্লোলের কাছে শুনে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে

বধ করে ঘুমাতেছি—'

কোন যুক্তিতে হিন্দু নিজেকে কনিষ্ঠের মতো আর খুনি মুসলমানকে অগ্রজ প্রতিম ভাবছেন? পাড়াটির নাম বললে আন্দাজ করা যেত।

মৃতদেহগুলি নাম বলছে যথাক্রমে, ইয়াসিন, হানিফ মহম্মদ, মকবুল, করিম, আজিজ। অন্য পক্ষের নাম গগন, বিপিন, শশী।

বলতেই হচ্ছে, এমন কোনো পাড়া সেদিন কলকাতায় ছিল না। পাঁচজন মুসলমান মারা গেছে, তিনজন হিন্দু! অসম্ভব কথা। আসলে জীবনানন্দ এখানে politically correct হবার চেষ্টা করেছেন।

পলায়নপর নিঃস্ব নারী জননী

সংসারের অত্যাচারে বলি পড়ত নারী। চিরকাল। এখন বিজ্ঞান ও বিচার ব্যবস্থা তাদের কিছু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ আর অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব অস্বীকারের এই সব ব্যবস্থা। তা তো সেদিন ছিল না। গ্রাম শহরে ফল হয়েছে মারাত্মক। সমাজের মেরুদণ্ডটাই গেছে ভেঙে। লক্ষ্য করেছেন জীবনানন্দ বড়ো মেজোবাবুরা দুলে বোয়েদের ডাক শাঁক শুনে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত। 'সময়ের হাতে অন্তহীন' তারা। মাঝি-বাগদিদের সন্ততিরাও 'এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়/ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে/মৃতপ্রায়'। কে তাদের কান্তিময় আলো দেখাবে?

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে জীবনানন্দ দাশের অপরিচিত প্রায় অগ্রন্থিত একটি সনেট। নাম 'দূর পথে জন্ম নিয়ে'। মাত্র চোদ্দটি পঙ্‌ক্তির সনেট-ধর্মী কবিতা। সম্পাদক শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত একে 'রূপসী-বাংলা'র কালের লেখা বলে শনাক্ত করেছেন। ঠিকই। লেখার ঢংটি তেমনই। তবে অন্তর্ভেদী চোখ ফেললে মনে হয় এ কবিতা ১৯৪৬-পরবর্তী। কেন, তা লিখছি। আগে লিখে রাখি, 'রূপসী বাংলা'-র লেখাগুলি ১৯২৫-এর পরের রচনা। সেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ', দেশবন্ধু ও অপর্ণা দেবীর নিভৃত উপস্থিতিও সেখানে আছে। (সূত্র : দেবেশ রায় সম্পাদিত' জীবনানন্দ সমগ্র'; রূপসী বাংলার বর্জিত পাঠ)। সে প্রসঙ্গ এখানে অনাবশ্যক, তাই আসছি না। 'দূর পথে জন্ম নিয়ে' প্রায় কুড়ি বছর পরে লেখা বাংলারই কথা, তবে সে বড়ো নিষ্ঠুর আত্মঘাতী স্মৃতি।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'দূর পথে জন্ম নিয়ে রহিতাম যদি আমি— কাফিরের ছেলে।' প্রথম কথা, আঁতুড় ঘরে না দূরপথে। কেন? পঙ্‌ক্তিটিতে দাঙ্গাবিধবস্ত বঙ্গীয় গ্রাম্য জীবনের চিত্র ধরা পড়ছে। কোনোক্রমে আশ্রয় লাভের পর নতুন জীবন সেখানে, 'সবুজ শাখার মতো... সচ্ছল'— অন্তত উদ্বেগহীন। বেঁচে থাকার সংকট সেই গ্রাম্য পরিবেশে 'অন্তরের অবসর' পেয়েছে, দেখেছে 'শান্ত' 'আকাশের তল'।

চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটি অদ্ভুত, মরমি, প্রতীকে মোড়া— আড়ালে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি। সম্ভবত পলাতকা জননীর। পূর্ণগর্ভা অবস্থায় যাকে ভদ্রাসন ছাড়তে হয়েছে। পথেই প্রসব করেছেন যিনি। 'কাফিরের ছেলে'-র মা।

বুক থেকে আমাদের আজিকার পৃথিবীর ফাঁস খুলে ফেলে ফাঁসগুলি অনুভব-বেদ্য। জীবনানন্দ স্পষ্ট করেননি। সমসাময়িক জগতের সংকটের ফাঁস। যন্ত্রণা ও উদ্বেগ ব্যাকুলতার, নিরাশ্রয়তার, অভাবিত অনাগত ভবিষ্যতের ফাঁস। হয়তো এক-কাপড়ে বের হওয়া জায়া-জননীর লজ্জা নিবারণের বাধ্যতার ইঙ্গিতও এখানে স্পষ্ট।

সমুদ্রও শুষ্ক হয়, 'চূর্ণ পৃথিবীর' 'কোলাহল' শেষ হয়— নেমে আসে নক্ষত্রের কিরালোক। সেইখানে এক অক্ষম হিন্দু জননীর ছবি আঁকেন জীবনানন্দ—

'সেই দূর আকাশের আলো আর আঁধারের সঙ্গে এক হয়ে রহিতাম সেইখানে জীবনের শিশুর মতো মুখ তুলে! কাফিরের ছেলের মতো।'

আবার আনেন কবি তাঁর উপরে ধৃত লাইনটি, প্রতিধ্বনির মতো।

'জন্মাতাম যদি আমি দূর পথে সকল শৃঙ্খল খুলে খুলে,— প্রভাতের সমুদ্রের সাদা ফেনা— মন্থন জলের মতো বয়ে।'

কেন এই পুনরাবর্তন? আসলে জীবনের ধারাবাহিকতা বোঝাতে চান কবি। যতই বর্বরতা আসুক— হিন্দু-জীবন প্রবহমান। তাকে নষ্ট-প্রনষ্ট-বিনষ্ট করা অসম্ভব।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদালয়ে পূর্বতন উপাচার্য)

কংগ্রেস ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন নয়, এটি ব্রিটিশের তৈরি একটি 'সেফটি ভালভ্'

কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে কখনোই গণতন্ত্র ছিল না— আজও নেই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুষ্ট করার যে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, আজ একটি পরিবারের হাতে সেই দল বিদেশি শক্তির এবং নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট করে চলেছে।

ডাঃ মধুসূদন পাল

জাতীয় স্তরে কংগ্রেস নয়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' হলো ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ডিসেম্বর ২৮, ১৮৮৫, বোম্বে শহরে। ঠিক ওই সপ্তাহে কলকাতা শহরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন হচ্ছিল ২৫-২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৫। রহস্যের বিষয়, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের একদম শেষ মুহূর্তে বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের সভায় যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। অথচ তার আগেই সারা ভারত থেকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা কলকাতা শহরে হাজির হয়ে যান। জাতীয় কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, কলকাতার ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে। নেপথ্য কারিগর প্রাক্তন আইসিএস অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। নথিপত্র দেখে এখন পরিষ্কার যে, ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের গোপন নির্দেশেই হিউম এই কাজ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয়দের হাতে তৈরি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অগ্রগতি থানিয়ে দেওয়া। ব্রিটিশ শাসনে কংগ্রেস কাজ করত 'সেফটি ভালভ্' হিসেবে।

ঐতিহাসিক সত্য এই, ১৮৫১-তে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন', ১৮৭৫-এ 'ইন্ডিয়ান লিগ', ১৮৭৬-এ বিবর্তিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এ। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে এইসব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কতিপয় ভারতীয়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে ভয় পাওয়ার এটাই ছিল প্রধান কারণ। পরিকল্পিতভাবেই কংগ্রেস সৃষ্টি করে ধ্বংস করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর রাজনৈতিক সত্তাকে। পরবর্তী সময়ে তা হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। কংগ্রেসকে বরাবর পর্দার পেছন থেকে পরিচালনা করেছে ব্রিটিশ। গান্ধী-নেহরুকে কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দান, ব্রিটিশের অসাধারণ রাজনৈতিক সাফল্য। জিন্না জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন।

তাই তাকে কংগ্রেসে উচ্চ পদ দেওয়া হয়নি। লোকমান্য তিলকের মতো সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে কংগ্রেস সভাপতি করা হয়নি। ১৯২০-তে কলকাতা কংগ্রেসে খিলাফতিদের দ্বারা রিগিং করে খিলাফত আন্দোলন প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছিল গান্ধীর স্বার্থে। এর প্রবল বিরোধী ছিলেন— লাল-বাল-পালের সমর্থকরা। বিরোধী ছিলেন দেশবন্ধু, অ্যানি বেসান্ত, জিন্না ও মালব্যজী। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে কংগ্রেসের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রই প্রথম ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এ কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি। তার আগে কখনো নির্বাচন হতো না। সবই পরিচালিত হতো এক রহস্যময় 'হাইকম্যান্ড'-এর নির্দেশে। ১৯৩৯ সালে নির্বাচিত সভাপতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জভাবে অসহযোগ আন্দোলন করেছিল গান্ধীর অনুগামীরা। ভারত বিভাজন প্রস্তাব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভায় দু'বার পরাজিত হয়। পরে তা গৃহীত হয় গান্ধীর অনুরোধে। বিভাজিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রায় কেউই নেহরুকে চাননি। সমস্ত ভোট পেয়েছিলেন প্যাটেল। শুধুমাত্র ব্রিটিশের গোপন নির্দেশমতো ও নিজের স্বার্থে গান্ধী 'হ্যারো কলেজে পড়াশোনা করা, ইংরেজিতে কথা বলা এক ব্যক্তিকে' ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চেয়েছিলেন।

ফলে ভোটে প্রায় শূন্য পেয়েও 'সেই ব্যক্তি' অর্থাৎ জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ভারত বিভাজনের পর কংগ্রেসের ইতিহাসে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাকেও নেহরু পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস হয়ে দাঁড়ায় নেহরু পরিবারের পারিবারিক কোম্পানি। কোম্পানির সবাই নেহরু পরিবারের। এদের আসল পদবি খান/নেহরু/ওয়াড্রা হলেও সবার পদবি 'গান্ধী'। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধী যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশান কেসে রাজনারায়ণের কাছে হেরে যান, তার সাংসদ পদ বাতিল হয়। তখন ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তিনি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এই হলো কংগ্রেসের গণতন্ত্র!

স্মরণীয়, ১৯৪৭-এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গত আট দশকের অধিকাংশ সময়ে এই পরিবারের লোকেরাই সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতির আসনটির দখল নিয়েছে। গান্ধীর যুগ থেকে কংগ্রেসে একটি 'হাইকম্যান্ড' তৈরি হয়েছে, যেটি এই ভারতের মানুষ কখনো চর্মচক্ষে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। এটি একটি অদৃশ্য শক্তি। এর কাজকর্ম আমেরিকার ডিপ স্টেট বা পাকিস্তানের আইএসআই-এর মতোই রহস্যময় এবং এই হাইকম্যান্ড ভয়ঙ্কর শক্তিধর। জনগণের আই ওয়াশের জন্য নাম কা ওয়াস্তে কাউকে কাউকে মাঝেমধ্যে সভাপতি করা হয়েছে গান্ধী পরিবারের বাইরে। কিন্তু তারা ছিল পুতুলনাচের পুতুল, তাদের কথায় কংগ্রেস কখনো কখনো চলেনি। তারা পরিচালিত হয়েছে 'হাইকম্যান্ড'-এর নির্দেশ মোতাবেক। এটাই নাকি কংগ্রেসের গণতন্ত্র। যাদের দলেই গণতন্ত্র নেই, তারা কী করে দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি মেনে কাজ করবে। এদের পরিবারিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভারতের জনমানসে কতগুলো মিথ্যা ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কাজে সহযোগিতা পেয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচারযন্ত্র এবং সরকারের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাকেন্দ্র— স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি থেকে। যেমন, ভারতবাসী নাকি কখনোই নিজের দেশকে নিজেরা পরিচালিত করতে পারবে না। ভারতের কোনো উজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য নেই। পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রথমে মুসলমানরা এবং পরে ইউরোপ থেকে ইংরেজরা এসে এদেশকে সভ্য করেছে। অর্থাৎ বিদেশি শক্তি অনুপ্রবেশের আগে ভারতবর্ষ বলে যেন কোনো দেশের অস্তিত্বই ছিল না। গান্ধী ও নেহরুই এই আধুনিক ভারতের স্রষ্টা। এইসব পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কিছু লোভী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী এবং পদলেহনকারী শিক্ষককে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদে বা বিভিন্ন সিলেবাস কমিটিতে এদের রেখে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিজ স্বার্থে নির্দিষ্ট করেছে, নিজেদের মনগড়া কিছু গল্পকে চালিয়েছে ইতিহাস বলে। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার বা যদুনাথ সরকার বা ধরম পালের লেখা ইতিহাস বইগুলোকে, শিক্ষাকেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শক্তিশালী করেছে তাদের মিথ্যা প্রচারকে।

১৯৫০ সালে যে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তাকে কংগ্রেস অবৈধভাবে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে বিকৃত করেছে। জরুরি অবস্থার সময় লোকসভায়-রাজ্যসভায় কোনো আলোচনা ব্যতিরেকেই পর্দার পেছন থেকে 'সেকুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট'— এই দুটো শব্দ যোগ করেছে সংবিধানের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধে। 'সেকুলার' শব্দের আভিধানিক অর্থ থেকে দূরে সরে নিজেদের স্বার্থে 'সেকুলারিজম'-এর অর্থ করা হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। এটা ইংরেজি শব্দটির একটা বিকৃত বাংলা অনুবাদ মাত্র। 'সেকুলার' শব্দের অর্থ— 'ধর্মহীন'। তারপর ভারতের সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষা, চাকরি, অনুদান— সবক্ষেত্রে 'কোটা' সিস্টেম এনে দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছে। মেধাকে পাঠানো হয়েছে কবরে বা শ্মশানে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস থেকে প্রকৃত ত্যাগীদের নাম ও অবদান সবই মুছে ফেলা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। বড়োজোর তাদের স্থান হয়েছে ইতিহাস বইয়ের ফুট নোটে।

অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম

ভারতবর্ষে যেখানে চোল-চালুক্য-মৌর্য-অহোম্ সাম্রাজ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ছিল, যেখানে মহান ছত্রপতি শিবাজী, মহারাণা প্রতাপের মতো প্রবল পরাক্রান্ত বীর ছিলেন, যেখানে গুপ্তযুগের মতো গৌরবময় অধ্যায় আছে— সেগুলোকে প্রায় সরিয়ে রেখে ইতিহাসে বাবর, আকবর, ঔরঙ্গজেবের মতো বাদশা, যারা লক্ষ লক্ষ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে, খুন করেছে কোটি কোটি হিন্দুকে— তাদের মহান করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সযত্নে। ইতিহাসকে সজ্ঞানে বিকৃত করে, ভারতীয় মনকে অবসাদগ্রস্ত, গ্লানিময় করে রাখার এ এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র। সবাই জানেন, রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বীকার করতেন না গান্ধী। সেই পথের পথিক নেহরু এবং তার কংগ্রেস। একইমত পরবর্তী প্রায় সমস্ত সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর। ব্রিটিশ এটাই চেয়েছিল। কারণ, ভারতের রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-পুরাণের মধ্যে আছে বিশাল জ্ঞানসম্পদ। এছাড়া সনাতন ভারতবর্ষের সভ্যতার যে বিশালতা— সময় এবং পরিমাপে; এসবকে ছোটো করে দেখালে বা অনৈতিহাসিক বলে প্রচার চালালে, ভারতীয়দের মনে একটা দুর্বলতা-হীনম্মন্যতা তৈরি করা যাবে; যার পরিণতিতে দীর্ঘদিন পরাধীন রেখে শাসন-শোষণ করা যাবে ভারতীয়দের।

মনে রাখতে হবে, খ্রিস্টমত ও ইসলাম যে শ্রেণীর 'রিলিজিয়ন' ও 'মজহব', সেই গোত্রে হিন্দুধর্ম পড়ে না। যিশু ও মহম্মদের মুখনিঃসৃত বাণীই হলো বাইবেল ও কোরান। হিন্দুধর্ম একক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বাণী নয়। তাই 'হিন্দু' ওইরকম 'রিলিজিয়ন' নয়; এটা ধর্ম, যা ভারতবর্ষ এবং তার সভ্যতাকে ধারণ করে রেখেছে বহু শতাব্দী ব্যাপী অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও। এই ঐতিহাসিক পরম সত্যকে কংগ্রেস ও তথাকথিত সেকুলারপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো স্বীকার করে না। তারা হিন্দুত্বকে খ্রিস্টান রিলিজিয়ন এবং ইসলামি মজহবের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে রেখেছে— এটা একটা মস্ত বড়ো বিকৃতিই শুধু নয়, ভারতবর্ষকে দুর্বল করার এটা একটা দুরভিসন্ধিমূলক কুৎসিত ষড়যন্ত্র। 'হিন্দুস্থান', 'হিন্দুত্ব' এই শব্দগুলো কোনো রিলিজিয়নভুক্ত নয়। এগুলো ভুগোল ও সভ্যতাকেন্দ্রিক। এগুলো সনাতন ভারতবর্ষের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের স্মারক। এদের এইসব চক্রান্ত থেকে ভারতবাসীর বেরিয়ে আসা দরকার।

পরিশেষে আবার বলি, কংগ্রেস কোনো ভারতীয়দের দ্বারা তৈরি হয়নি। এটা ১৮৮৫-তে ভাইসরয় ডাফরিনের মস্তিষ্ক প্রসূত হিউমের তৈরি। সেদিন মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সামনে রাখা হয়েছিল বাঙ্গালি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কংগ্রেস একটি বড়ো ধোঁকা। সম্মিলিতভাবে উচ্চকণ্ঠে বলতে হবে, কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে কখনোই গণতন্ত্র ছিল না— আজও নেই। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পুষ্ট করার যে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, আজ একটি পরিবারের হাতে সেই দল বিদেশি শক্তির এবং নিজেদের স্বার্থ পুষ্ট করে চলেছে।

ভারত সভা ও কংগ্রেসের তথ্যসূত্র : Renascent India (Nineteenth Century) by Dr. R.C. Mazumdar.

সংবেদনা

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকপিয়ন ডাকলেন, বাড়িতে কেউ আছেন? চিঠি আছে নিয়ে যান।

ভেতর থেকে একটি বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর এল, আসছি, একটু অপেক্ষা করুন।

পাঁচ মিনিট হয়ে যাবার পর পিয়ন আবার বললেন, আপনাদের চিঠি আছে, নিয়ে যান। আমাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

ভেতর থেকে আবার মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, পোস্টম্যান কাকু, তাড়া থাকলে দরজার তলা দিয়ে চিঠিটা দিয়ে দিন. আমার একটু সময় লাগবে।

এবার ডাকপিয়ন বিরক্ত হয়ে বললেন, না, আমি অপেক্ষা করছি। রেজিস্ট্রি চিঠি তো, সই করতে হবে।

এরপর পর প্রায় দশ মিনিট পরে একটি বাচ্চা মেয়ে দরজা খুলল। পোস্টম্যান দেরির জন্য সত্যি সত্যি খুব রেগে গিয়েছিলেন। মেয়েটিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে তার রাগ মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল। দেখলেন, তার সামনে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার দুটি পা-ই নকল। মেয়েটি বিনম্রভাবে পোস্টম্যানের দিকে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা চাইল। ডাকপিয়নও নিঃশব্দে সই করিয়ে চিঠিটি তার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

দিব্যাঙ্গ মেয়েটি বাড়িতে একাই থাকে। তার মা নেই। বাবা কাজের জন্য রোজ বাইরে যান। মেয়েটির দেখাশোনা ও রান্নাবান্নার জন্য একজন মহিলা সকাল-সন্ধ্যা আসেন। কাজকর্ম করে চলেও যান।

সময় যেতে থাকে। কখনো পনেরো দিন পর, কখনো মাসে বা দুমাসে একবার যখনই তাদের বাড়িতে চিঠিপত্র আসে, পোস্টম্যান ডাকেন, মেয়েটি না আসা পর্যন্ত শান্তভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর মেয়েটির হাতে চিঠি দিয়ে চলে যান। মেয়েটির প্রতি তার স্নেহ বাড়তে থাকে।

একদিন মেয়েটি খুব মনোযোগ দিয়ে পোস্টম্যানের পায়ের দিকে তাকাল, দেখল তার পায়ে জুতো নেই। তিনি খালি পায়েই বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করে বেড়ান।

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল এসে গেল। একদিন ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে চলে গেছেন, মেয়েটি নরম মাটিতে পোস্টম্যানের দু' পায়ের ছাপের উপর দুটো কাগজ রেখে পায়ের ছবি নিল। পরের দিন বাড়ির কাজের সেই ভদ্রমহিলাকে দিয়ে ওই মাপের জুতো কিনে আনিয়ে রেখে দিল।

বর্ষা কেটে গিয়ে শরৎকাল এল। দুর্গাপূজার ঠিক আগে একদিন পোস্টম্যান চিঠি বিলি করতে করতে মেয়েটির বাড়িতে এল। কিন্তু সেদিন তার জন্য কোনো চিঠি ছিল না। দরজায় কড়া নাড়াতে ভেতর থেকে মেয়েটি বলল, কে?

— আমি তোমার পোস্টম্যান কাকু।

মেয়েটি দরজা খুললে ডাকপিয়ন তার হাতে এক প্যাকেট চকোলেট দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার গরিব কাকুর পূজার উপহার।

মেয়েটি খুব খুশি হলো, তারপর পোস্টম্যানকে একটু দাঁড়াতে বলে ভেতর থেকে একটি বড়ো বাক্স নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বলল, কাকু, পূজাতে তোমার জন্য আমারও এই ছোট্টো উপহার। পোস্টম্যান বাক্সটি দেখে অবাক হলেন, কী বলবেন কিছু বুঝতে পারলেন না। আনন্দে তার দুচোখে জল এল। মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

বাড়িতে এসে পোস্টম্যান বাক্সটি খুলে একজোড়া জুতা দেখে খুব অবাক হলেন। কেননা, এরকম একজনের কাছ থেকে এই উপহার যার দুটো পা-ই নেই। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে একটি ছোটো মেয়ে তার খালি পায়ের জন্য এতটা উদ্বিগ্ন হতে পারে। আনন্দাশ্রু তার দু'গাল বেয়ে নামতে লাগল। তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মৃগবনি

মৃগবনি জাতীয় উদ্যান তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদে অবস্থিত। এটি ৩.৬ বর্গকিলোমিটার বা ১২১১ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। উদ্যানে ৬০০ রকমের গাছপালা রয়েছে। এই উদ্যানে কয়েকশো ডোরাকাটা হরিণ আছে। এছাড়াও বনবেড়াল, খরগোশ, ভাম, চিতল হরিণ, নানা জাতের সাপ ও ইঁদুর রয়েছে। ১০০-র বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। এখানে সাফারি, ওয়াচ টাওয়ারে উঠে দেখা এবং রিসর্টে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। উদ্যানের ভেতরে রয়েছে জাদুঘর ও অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি। এটি মহাত্মা গান্ধী বাস স্টেশন (এমজিবিএস) থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে মইনাবাদ মণ্ডলের চিলকুরের কাছে অবস্থিত। এখানে বিখাতে চিলকুর বালাজী মন্দির রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯২

पुरत:, पृष्ठत:, वामत:, दक्षिणत:, उपरि, अध: ।
(সামনে, পেছনে, বামদিকে, ডানদিকে, উপরে, নীচে)

पुरत: (সামনে)

मन्दिरस्य पुरत: पुष्करिणी अस्ति।
মন্দিরের সামনে পুকুর আছে।

चषककस्य पुरत: चमस: अस्ति।
दूरदर्शनस्य पुरत: कूपी अस्ति।
गृहस्य पुरत: तुलसीवेदी अस्ति।

ভালো কথা

শীত

কদিন থেকে খুব শীত পড়েছে। তার সঙ্গে আবার হাওয়া। শীতে সবাই কাঁপছে। মা বাড়ির সবার শীতের জামাকাপড় বের করেছে। আমাদের বাড়ির নীচে ফুটপাথে একটি পরিবার থাকে। ওদের বাচ্চাকটি সকাল সন্ধ্যায় শীতে কাঁপতে থাকে। গতকাল আমি স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখলাম এদের বড়ো ছেলেটো আমার দাদার সোয়েটার গায়ে দিয়ে রাস্তায় খেলছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ও বলল তোমার দাদা দিয়েছে। আমি রাতে পড়তে বসে দাদাকে বললাম ওকথা। দাদা বলল, ওটাতো আমার ছোটো হয়ে গেছে, তাই দিয়েছি। শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। আমি বললাম, আমারও ছোটো হয়ে যাওয়াগুলো ওদের দিয়ে দেব। দাদা বলল, মা যেন না জানে। কখন যে মা পেছনে এসে দাড়িয়েছে, আমরা দেখিনি। একটু হেসে মা বলল, ছোটো হয়ে যাওয়া জামাকাপড় তো কাউকে দিয়ে দেওয়া খুব ভালো।

রত্না রায়, অষ্টমশ্রেণী,বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভাই

শ্রেয়া চক্রবর্তী, ষষ্ঠশ্রণী, চাকদহ, নদীয়া

হাঁটি হাঁটি হাঁটছে ভাই
হাততালিও দিচ্ছে তাই,
হাঁটতে হাঁটতে যায় যে পড়ে
কাঁদতে থাকে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে।
তখনই আমি দৌড়ে গিয়ে
ভাইকে কোলে তুলে নিয়ে,
চোখ দুটি তার মুছে দিয়ে
আদর করি খুবটি করে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

এক বিপ্লবীর আত্মকথা

সুব্রত চাকী

পরাধীন ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের এক তরুণ বিপ্লবী বীর বিভূতিভূষণ সরকার ছিলেন 'যুগান্তর' গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির এক নিষ্ঠাবান কর্মী। বহু অনামি, বিপ্লবী তরুণদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এই বিপ্লবী ছিলেন বঙ্গের প্রথম হুতাত্মা প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখের সতীর্থ। এই অনামি বিপ্লবীর অপ্রচলিত আত্মকথা নতুন করে প্রকাশ করার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এই অনুলিখন। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে তাঁর এই আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছিল। বিভূতিভূষণ সরকারের জন্ম ১৮৮৮ সালের ১ জানুয়ারি। তাঁর পিতার নাম সারদাপ্রসন্ন সরকার। এই বিপ্লবীর জন্ম হয় নদীয়া জেলার শান্তিপুরের শান্তিগড়ে। নীচে এই বিপ্লবীর আত্মকথা প্রকাশিত হলো।

বিভূতিবাবু লিখেছেন—

'আমি প্রথমে শান্তিগড়ে আমাদের গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা-পড়া আরম্ভ করি। আমার বয়স যখন ৯ বৎসর তখন বাঁকুড়ায় আমার মামাতো ভাই ডাক্তার কালীকৃষ্ণ মিশ্রের বাড়ী যাই। সেখানকার পাঠশালায় পড়া শেষ করিয়া নিজ গ্রামে চলিয়া আসি।

আমার বয়স যখন ১৬ বৎসর তখন আমার পিতাঠাকুর চট্টগ্রামে কনট্রাক্টরি কাজ করিতেন। ১৯০৪ সালে তিনি আমাকে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন।

কেন জানি না—পিতাঠাকুর আমাকে চট্টগ্রাম স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিলেন। তখন এই স্কুল ছিল ২০৮ নং বহুবাজার স্ট্রীটে। আমি কলিকাতায় আসিয়া ভর্তি হইবার পর বৎসরই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহার পরের বৎসর ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

'যুগান্তর' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ৪১ নং চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে যুগান্তর বোর্ডিং নামে একটি বোর্ডিং খোলা হইল। এইখানে নানা জিলার ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীরা থাকতেন। আমিও এই যুগান্তর বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি হইলাম। যে সময় উল্লাসকর দত্তের সহোদর সুখসাগর দত্ত এবং রংপুরের কয়েকটি ছাত্রও যুগান্তর বোর্ডিংয়ে থাকিত। উল্লাসকর দত্তের পিতাঠাকুর দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় কি উপলক্ষ্যে মনে নাই একদিন সুখসাগর তাঁহাদের শিবপুরের বাড়ীতে আমাকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। যুগান্তর বোর্ডিংয়ে রংপুরের ছাত্রদের কাছে একটি ছেলে মাঝে মাঝে আসিত। নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে তাহাকেও সেদিন ওখানে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে দেখিতে পাই। পরে জানিলাম তাহার নাম প্রফুল্ল চাকী। সেই দিনই শিবপুরে প্রফুল্লর সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হইল।

এই পরিচয়ের পরে আমিও বারীনদার মুরারীপুকুর বাগানে স্থান পাই। সেখানে গীতার শিক্ষা পাইতে লাগিলাম। এইভাবে আমিও বিপ্লবী দলে যোগদান করি। সেখানে তখন প্রফুল্লকে আমার সহকর্মী রূপে পাই। দুইজনে একই পথের পথিক হইলাম। একই মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করিতে যাইয়া

ফঃ ৬

আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হইল। প্রফুল্লর নির্ভীকতা, কর্ম্মনিষ্ঠা, দেশসেবার সত্যিকার আগ্রহ ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা কি নেতা কি সহকর্ম্মী সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তখনকার দিনে বিপ্লবী দলে স্থান পাওয়া সহজ কাজ ছিল না। তারপর স্থান পাইলেও নানাপ্রকার শিক্ষা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া সভ্যকে নিজের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিতে হইত। প্রফুল্লর মত আমারও ভাগ্য ভাল, তাই আমিও কাজের উপযুক্ত ও বিশ্বাসভাজন বলিয়া গণ্য হইলাম।

ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশ্যাল ট্রেন ধ্বংস করিবার চেষ্টা আমাদের দল দুইবার করিয়াছিল। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে চন্দননগরে প্রথম সে চেষ্টা হয়। বারীনদা, উল্লাসকর, প্রফুল্ল চাকী ও আমি এ কাজের জন্য চন্দননগর যাই। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা সফল হইল না। কেন হইল না, এত বৎসর পরে স্বাধীনতা লাভের পর ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। ইহার পর নারায়ণগড়ে ছোটলাটের ট্রেন উড়াইবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা হয়। সে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বরের কথা। স্থান নির্ব্বাচনের জন্য প্রথমে হরিশ ঘোষ, শান্তি ঘোষকে পাঠান হয়। কিন্তু তাহারা স্থান নির্ব্বাচন ভালোভাবে করিতে পারে নাই বলিয়া পরে প্রফুল্ল চাকী ও আমাকে পাঠানো হইল। নারায়ণগড় ও বেনাপুর স্টেশনের মধ্যে একটা স্থান প্রস্তুত করিয়া লই। আমাদের কাজের একটা নিয়ম ছিল যে, যখন আমরা কোন শহরে যাইতাম, তখন সেই স্থানে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোকে কেন্দ্র করিয়া নকশা আঁকিতাম এবং ওখানকার পথ ঘাট চিনিয়া লইতাম।

৬ ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের পূর্ব নির্ব্বাচিত স্থানে ছোটলাটের ট্রেন ধ্বংসের জন্য প্রায় এক ফুট গর্ত করিয়া বারীনদা, প্রফুল্ল চাকী ও আমি মাইন পুঁতি। ফিউজ রেললাইনের উপরে রাখিয়া একটি সূতায় ঢিল বাঁধিয়া দিলাম যেন হাওয়ায় উড়িয়া না যায়। বারীনদা সে রাত্রেই কলিকাতায় আসেন। আমরা মাইন বসাইবার পর যখন প্রায় দেড় মাইল দূরে চলিয়া আসি তখন মাইন ফাটিয়াছিল।

সেদিন অমাবস্যা রাত্রি ছিল। মেদিনীপুর যাইতে হইলে রেলওয়ে ক্রসিং পার হইয়া যাইতে হয়। সেখানে একজন পয়েন্টসম্যান ছিল বলিয়া তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য আমরা দুইজনে আঁকাবাঁকা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া মেদিনীপুর রওনা হই। অনেক জায়গায় জল কাদা ছিল। আমাদের পা কাঁটা ইত্যাদিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। প্রফুল্লের সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। কষ্টসহিষ্ণুতায় তাহার জোড়া আমাদের দলে কেহ ছিল কিনা আমার জানা নাই। পরদিন আমরা এক প্রকার নিরাপদে মেদিনীপুর জিলা কন্‌ফারেন্সে পৌঁছিলাম। সকাল বেলা ক্ষুদিরামের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। সে আমাদের পরিহাস করিয়া বলে যে, স্বপ্নে দেখিয়াছে ছোটলাট মরে নাই। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতেছি যে, খড়্গপুরে একজন মারাঠি রেল কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা ছোটলাটের ট্রেনের আসা-যাওয়ার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পর আমি কিছুকাল ক্ষুদিরামের সঙ্গে মেদিনীপুরের তাঁতশালায় থাকি। সেখানে সত্যেন বসুর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত কাজ করি। তথায় সত্যেন বসুর সহোদর জ্ঞানেন্দ্র বসু, বিপিন বসু প্রমুখের সহিত আমার পরিচয় হয়। মেদিনীপুর জিলা কন্‌ফারেন্সের পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ একবার মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের দেশের কাজে খুব উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন যে, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে।

যুগান্তর বোর্ডিংয়ে থাকা কালে আমি লাঠিখেলা ইত্যাদি শিখিবার জন্য মহেশালয় নামক ব্যায়ামাগারে ভর্তি হইয়াছিলাম। সেখানে উলুবেড়িয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল অতুল বোসের নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করি। নাটোরের সতীশ সরকার আমাদের দলে ছিলেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু বৃদ্ধ ও অন্ধ। সতীশবাবু আমাদের খবর দিলেন যে, কোনও একজন অজ্ঞাতনামা দেশহিতৈষী গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। পাটনায় মাদারল্যান্ড (Motherland) নামক কাগজের সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট গেলে এই বিষয় বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাইবে। উপেনদা (শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীউল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, আরও একজন (সম্ভবতঃ সতীশ সরকার) এবং আমি এই পাঁচজন পাটনায় যাই। সেখানে বাঁকীপুরের উকিল কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠি। ইনি আমাদের দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী আমাদের পুত্রের ন্যায় আদর যত্ন করেন; তিনি আমাদের পঞ্চপাণ্ডব নাম দিলেন। তাঁহার কথাবার্তায় ও আদর-যত্নে মনে হইল তিনি আমাদের বিপ্লবী দলের লোক বলিয়া জানেন।

সেখানে কেদারবাবু ঠাকুরদাস বাবা নামক একজন সাধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন। সেদিন ছিল ১৯০৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। সাধু বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে আমাদের 'ধুনি-সাহেব' নামক স্থানে যাইতে হইবে। ধুনি-সাহেব নেপাল রাজ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট একটা মঠ। ঠাকুরদাস বাবা সেই মঠের মালিক। আমরা পাটনা হইতে মজঃফরপুর ও সমস্তিপুর হইয়া ভাটিসাই স্টেশনে নামিলাম। সেখান হইতে হাঁটিয়া ভেরিয়া মঠ, হনুমান নগর ইত্যাদি স্থান হইয়া চারিদিনে ধুনি সাহেব মঠে পৌঁছাই। মঠে ঠাকুরদাস বাবা আমাদের দীক্ষা দিলেন। গুপ্ত সমিতির কাজের জন্য আমরা টাকা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। সুতরাং টাকা পাইবার আশায় আমরা পাঁচজনে বিনা বাক্যব্যয়ে দীক্ষা নিলাম। দীক্ষান্তে আবার সেই সাধুর সঙ্গে পাটনায় ফিরিয়া আসি। পাটনায় তিনি আমাদের বলেন যে, গয়ায় তাঁহার একশত গুহা

আছে, পাঁচটা গুহা তিনি আমাদের দিবেন। সেখানে গুহাবাসী হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মতে বেদান্ত পাঠ করিয়া ধর্ম জীবন যাপন করিতে হইবে, তারপর তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আমাদের টাকা দিবেন। সাধু বাবাকে শেষ প্রণাম জানাইয়া আশাভঙ্গের মনস্তাপ লইয়া আমরা মুরারীপুকুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই স্মৃতিকথা শেষ করিব। ঘটনাটি ছোট হইলেও ইহার মধ্যে প্রফুল্লের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। মুরারীপুকুরের বাগানে থাকাকালে একদিন প্রফুল্ল বাগানের ভিতরে একটা গাছে উঠিয়া বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছিল। গীতা পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—''আমি কি, তা জানা দরকার। যদি এখন নীচে প'ড়ে যাই, তা'হলে বুঝতে পারব শরীরের ধর্ম্ম কি?'' এই বলিয়া সে নীচে পড়িয়া গেল এবং ব্যথা পাইল। তারপর বলিল—''শরীরের ধর্ম্ম আঘাতের অনুভূতি।''

তারপর মজঃফরপুরের বোমার ঘটনা, প্রফুল্লর আত্মহত্যা বা আত্মবলি এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি। প্রাচীনদের কাছে সেই সকল ঘটনা পুরাতন কাহিনি। স্বাধীন দেশের নবীনদের আজ সে সকল কথা জানিবার ও শুনিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সকল কাহিনি পুরাতন হইলেও ইহাদের মধ্যে একটা নূতনত্ব থাকিয়া যায়। দেশের ও জাতির বীরত্বের গাথা এবং ত্যাগের কাহিনির যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। বৈপ্লবিক কাজ ভারতবর্ষে প্রথম আমাদের দলকেই করিতে হইয়াছিল। আমাদের ব্যর্থতা এবং ভুলত্রুটি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের কর্মীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আর একটা কথা সাধারণ মানুষ ভুলিয়া যায়। তাহা এই যে, বৈপ্লবিক কার্য্যের কোনও বৃহৎ চেষ্টা আপাতত বিফল হইলেও ভবিষ্যতে তাহা সুফল দিয়া থাকে।

মজঃফরপুরের বোমার ঘটনাই ধরা যাক। মিঃ কিংসফোর্ড বাঁচিয়া গেলেন, ভুলে অন্য দুইটি মহিলা মারা গেলেন। প্রফুল্ল দলের নেতার আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া পুলিশের হাতে ধরা দিল না; কেননা ধরা দিলে যদি গুপ্ত কথা জানিবার জন্য অমানুষিক অত্যাচার হয়, তবে হয়তো তাহার মুখ দিয়া অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গোপন কথা বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে নিজ হাতে নিজের জীবন শেষ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই। সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শরীরের এমন অংশ বাছিয়া পিস্তলের গুলি ছাড়িল যাহাতে মানুষের বাঁচিবার কোনও রকম সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শরীরের এইরূপ অংশে একটা গুলিই মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রফুল্লর বীরের মতো আত্মবলিদান দেশকে অবাক করিল। কেননা বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালির ভীরু বলিয়া অপবাদ ছিল। দেশের লোক সহজে বিশ্বাস করিল না, যে বাঙ্গালীর ছেলে এমনি সাহসের কাজ করিতে পারে! প্রফুল্লর আগেই তাহার সঙ্গী পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। বিচারে তাহার ফাঁসি হইল। ধরা পড়ার পর হইতে কি বিচারের সময়, কি ফাঁসির সময়, কোন সময়ই ক্ষুদিরাম মনের বল হারায় নাই। সে দেশের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে লেশমাত্র ভয় না করিয়া ফাঁসির রজ্জু গলায় পরিয়াছে।

এইভাবে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল এবং দেশের যুবকদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা জোগাইল। তাই তাহাদের পরেও আমরা আরও অনেক প্রফুল্ল ও অনেক ক্ষুদিরামের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

মজঃফরপুরের ঘটনার পর ২ মে (১৯০৮) মুরারীপুকুরের বাগানে বারীনদা, উপেনদা, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, পরেশ মৌলিক প্রমুখের সঙ্গে আমিও ধরা পড়ি। আলিপুর বোমার মামলায় সেশন জজের বিচারে আমারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল। হাইকোর্টে আপিলে আমার সাজা কমাইয়া দশ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হইল।

দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিয়া আমি দেশে ফিরিলাম।

যেদিন আমরা ধরা পড়িলাম সেদিন আমাদের অনেকেরই মনে এই ভাবিয়া দুঃখ হইয়াছিল যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের কাজ কত পিছাইয়া গেল। কিন্তু পরে সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে।

দেখিলাম যে আগুন আমরা জ্বালাইয়া দিয়াছি, তাহা নিভিয়া যায় নাই; ভারত স্বাধীন হইয়াছে। আমাদের যৌবনের স্বপ্ন বার্দ্ধক্যে সফল হইল। আমি আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক, এই কথা ভাবিতেও কত আনন্দ।' □

সংশোধনী

গত ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদ নিবন্ধের লেখার শুরুতে মুদ্রণ বিভ্রাটের কারণে কিছুসংখ্যক বইয়ে শুরুর কয়েকটা লাইন ছাপা হয়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। লেখার শুরুর কয়েকটা পঙ্‌ক্তি এখানে তুলে দেওয়া হলো।

—সঃ স্বঃ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সঙ্ঘ-শক্তি তৃণভূমে গ্রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ

বিদ্যুৎ মুখার্জি ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন দ্বাপর ও কলিযুগের সংযোগস্থলে। এই দ্বাপরযুগের বাণীই কলিযুগের পথ। এই বাণীতেই পাপপ্রবর্তকের রাজ্যকাল, সামাজিক অবনতি এবং আধ্যাত্মিক অধোগতি দূর হবে। দূর হবে রাজ্যের গ্রহের দশা। এই বাণী নিয়ে আসবে সত্যযুগের মহালয়া ও

তাঁর মহৎ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান সরকার মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মতো কোনো বিদেশিকে সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান— 'Order of the Rising Sun' প্রদান করেছে।

ভারত-জাপান মৈত্রী স্থাপনায় অগ্রণী ছিলেন রাসবিহারী বসু

প্রণব দত্ত মজুমদার

রাসবিহারী বসু যখন মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যে জাপানে গিয়ে তিনি তাঁর পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম আরম্ভ করবেন, তখন থেকেই তিনি জাপানের রাজনীতি, তাঁদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একটি অজানা দেশে গিয়ে যখন দেশের জন্য কাজ করবেন তখন সে দেশের সহযোগিতা ও আস্থা তাঁকে অর্জন করতে হবে এবং সে দেশের লোকদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে হবে; তার জন্য তাঁদের সম্পর্কে বিশদে জানা প্রয়োজন।

তখনকার বিখ্যাত কাগজ 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের লেখা থেকে তিনি জানতে পারেন— 'জাপান ভারতের মিত্র নহে--- শত্রু। জাপান ইংরেজের মিত্র এবং আবশ্যক হইলে ভারতে ইংরেজ রাজ্য রক্ষার্থে ইংরাজকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবে। তাহার কারণ জাপান ভারতে ও অন্যত্র ইংরেজ সহায়তায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য উদ্‌গ্রীব।' কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ভারতে বসে এসব কথা লেখেননি; তিনি জাপানে গিয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ করে একথা লিখেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব জেনেও রাসবিহারী বসু জাপান যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন কেন? আসলে গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এই মহান বিপ্লবী উপলব্ধি করেছিলেন যে জাপানের বর্তমান রূপ তার চিরকালীন স্বাভাবিক রূপ নয়। জাপান স্বাধীন দেশ হলেও বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাসের প্রেক্ষিতে ইউরোপ, আমেরিকার শক্তির তুলনায় দুর্বল; তাই ইংরেজ ও মার্কিন শক্তির চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানারকম অপমানজনক ও অনৈতিক কাজ তাকে করতে হচ্ছে। ইংরেজ ও মার্কিনদের এসব অপমানজনক চাপ সে নীরবে সহ্য করছে বটে কিন্তু নিপ্পনবাসীদের অন্তরে স্বাভিমানের আগুন প্রজ্বলিত আছে এবং সময় ও সুযোগ এলে তাঁরা পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেই। সেক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বভাব নিয়ে এশিয়াবাসী হিসেবে আন্তরিকতার সঙ্গে জাপানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে, তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে একত্রে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অসম্ভব নয়। ভূ-রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঠিক পর্যবেক্ষণ করে ধৈর্যসহকারে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে পারলে একদিন-না-একদিন সুফল মিলবে— এ বিশ্বাস তাঁর ছিল; তাই মহান বিপ্লবী রাসবিহারী ঠিক করলেন এ কঠিন পথেই তিনি এগুবেন।

তাই জাপানে যাওয়ার পরে নানারকম বাধাবিপত্তির মধ্যেও ভারত-জাপান মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার মানসে তিনি জাপানি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করলেন। তাঁদের ভাবধারা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাঁদের মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করলেন। এ ব্যাপারে বিধাতাও যেন তাঁর সহায় হলেন। তাই তিনি সতীসাবিত্রী স্বরূপা এক জাপানি কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে পেলেন এবং তাঁর মাধ্যমে ও তাঁর শ্বশুরকুলের সহায়তায় জাপানি সমাজ এবং তাদের কৃষ্টি সভ্যতাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও আত্মস্থ করার সুযোগ পেলেন এবং ভারত-জাপান মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করার কাজে দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

গভীর পর্যবেক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজ- জাপানের বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী। এমতাবস্থায় আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করলে একদিন-না-একদিন ভারত ও

জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশে জাপান এসে দাঁড়াবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাপানি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে 'ভারত-জাপান মৈত্রী সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। তিনি রন্ধনশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'নাকামুরায়া' বেকারিতে তাঁর ভারতীয় রেসিপির খাবার কেমন বিখ্যাত হয়েছিল সে কথা আগের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় খাবারকে জাপানিদের কাছে পরিচিত করাবার জন্য 'ভিলা এশিয়ান' নামে এক রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন। জাপানি মানুষ যারা এখানে ভারতীয় খাবার পরখ করতে আসতেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ভাবের আদানপ্রদান করতেন রাসবিহারী বসু। প্রতি রবিবার তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে রান্নার কাজ পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত জাপানিদের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে গভীর আলোচনায় মেতে উঠতেন। জাপানিরা খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুনতেন। জাপানে অবস্থিত ভারতীয়রাও ভারতীয় খাবারের সন্ধানে সেখানে আসতেন; তাঁদের সঙ্গে জাপানিদের ভাবের আদানপ্রদান হতো। এক কথায় ভারত-জাপান সম্প্রীতির একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই রেস্টুরেন্ট (অনেকটা কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসের মতে--- যা কিনা একসময় কলকাতা তথা বঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের ভাব আদানপ্রদানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল)।

তিনি জাপান ও জাপানি নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত হলেন। তিনি 'নিউ এশিয়া' এবং 'এশিয়ান রিভিউ' নামক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। নিউ এশিয়া পত্রিকাতে ইংরেজের রাজনীতি, তাঁদের ভারত শাসন-পদ্ধতি ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করে লেখা হতো। ভারতে ইংরেজের অপশাসন, শোষণ ইত্যাদি নিয়ে তিনি জাপানের বিভিন্ন বক্তৃতা-সভায় বক্তৃতা করে বেড়াতেন। তাঁর বক্তৃতা-কৌশলের গুণে সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। তিনি তাঁর চুম্বকীয় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে ক্রমশই জাপানি জনমানসে গভীর ছাপ ফেলতে সমর্থ হলেন। তাঁর ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানের গভীরতা দেখে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভারত ও পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস'-এর অধ্যাপক নিযুক্ত করে। টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহিতোকা রাসবিহারীর ভ্রাতাকে রাসবিহারী সম্পর্কে বলেছিলেন--- "রাসবিহারীর মুখনিঃসৃত জাপানি ভাষা ছিল মধুর, সুবিন্যস্ত ও গতিশীল। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষা, তাঁহার শান্ত ও সংযত বক্তৃতাভঙ্গী শ্রোতাকে অচিরে মুগ্ধ করিয়া ভক্তে পরিণত করিত। সাধারণত তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারত'। ভারতের বিষয় বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি আবেগভরে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বলিতেন— ভারত জাপান এককৃষ্টির দুই শাখা, সুতরাং ভারত-জাপান মৈত্রী স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। সমগ্র এশিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে করিতে জাপানেকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। শুধু ছাত্ররা নহে, জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিত। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী শুনিত। ফলে অনেকেই এই অপূর্ব সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হইয়া অচিরে তাঁহার ভক্ত হইয়া সাহচর্যে আত্মনিয়োগ করিত।"

একথা থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে রাসবিহারী বসু জাপানি শিক্ষিত সমাজকে কী বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জাপানের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা কমিটিতে স্থান পেয়েছিলেন। তিনি কোরিয়াতেও অনেক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা কমিটিতে যোগদান করেছিলেন। তিনি কোরিয়া পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন। সেখানকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি জাপান প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে জাপানে 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি' তৈরি করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান-প্রবাসী ভারতীয়দের পথপ্রদর্শক নেতা হয়ে যান। ১৯২৩ সালে তিনি জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯২৪ সালে গঠন করেন 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'। ১৯২৬ সালে স্থাপন করেন 'প্যান এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। তিনি তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার ফলে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিভাবান মহান বিপ্লবী রাসবিহারী ভারতকে জাপান তথা পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য এবং ভারত ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক মেলবন্ধনের জন্য কলম ধরেছিলেন। তিনি জাপানি ভাষায় এতটাই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে জাপানি ভাষায় তিনি একের পর এক পুস্তক রচনা করে গেছেন। তিনি যে সমস্ত পুস্তক জাপানি ভাষায় লিখেছেন তার ইংরেজি নামগুলো হলো— 1. Panoramic Views of Asian Revolution, 2. Wits and Humours of India, 3. India Oppressed, 4. Stories of Indian People, 5. India in Revolution, 6. Victories of young Asia, 7. India Crying, 8. Bhagavat Gita, 9. Tragic History of India, 10. India in Bondage, 11. Dawn of Independent India, 12. Ramayana, 13. India of Indians, 14. Last Song (রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র জাপানি অনুবাদ), 15. Bose Appeals, 16. Struggle for Independence। এই সমস্ত পুস্তক ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে রচিত হয়। এভাবে তিনি ভারতের সমাজ, ভারতের কৃষ্টি সভ্যতা, ভারতের দুঃখ দুর্দশা, আনন্দের কথা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, ভারতবাসীদের কথা জাপানবাসীদের কাছে তুলে ধরে তাঁদের

মনের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন।

রাসবিহারী বসুর ভারত-জাপান মৈত্রী গড়ার এই নিরলস প্রচেষ্টাকে যে ভারতের নেতৃবৃন্দ ও বৌদ্ধিক সমাজ অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন তা কিন্তু নয়। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মতো জাপান সম্পর্কে সন্দেহের একটি বাতাবরণ তাঁদের মনে বরাবর ছিল। সেই সন্দেহকে উসকে দিল ১৯৩৭ সালে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ। জাপানি সৈন্যরা চীনা ভূখণ্ডে গিয়ে তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে এটা ভারতীয় নেতারা ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভ দেখতে পেলেন এ যুদ্ধে এবং জাপান সম্পর্কে নিজেদের অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন। আসলে এর পিছনে ছিল মার্কিন চক্রান্ত। চীনে তখন মার্কিন-ক্রীড়নক চিয়াং কাইশেকের প্রশাসন চলছে। মার্কিন শাসকরা চীনের বাজারে মার্কিন ব্যবসায়ীদের একছত্র আধিপত্য কায়েম করার জন্য চিয়াং কাইশেকের সরকারকে পিছন থেকে নানারকম ভাবে উত্তেজিত করছিল এবং মদত দিচ্ছিল যাতে চীনের বাজার থেকে জাপানি শিল্পপতিদের উৎখাত করা হয়; এবং মার্কিন ক্রীড়নক চিয়াং কাইশেক নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে চীনা জনগণের স্বার্থ বলি দিয়ে হলেও মার্কিনিদের হাতে খেলছিল এবং জাপানকে যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। চিয়াং কাইশেকের চিৎকারে এবং জোরালো মার্কিন প্রচারতন্ত্রের কৌশলে জাপান সম্পর্কে ভুলবার্তা চারদিকে রটে গেল। পাশ্চাত্য শক্তির এ ভয়ানক ইকোসিস্টেম এখনো সমানভাবে সক্রিয় আছে। এতে বিভ্রান্ত হয়ে ভারতের নেতারা এবং ভারতের বৌদ্ধিক সমাজ জাপানের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। এমনকী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ইংরেজ ও মার্কিনিদের এই দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে জাপানের নীতিকে সমালোচনা করেছিলেন। ভারতের বণিক সমাজও বিভ্রান্ত হয়ে জাপানকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। ভারতের এই ভূমিকার ফলে জাপানে অবস্থানরত ভারত-জাপান মৈত্রীর পথপ্রদর্শক রাসবিহারী বসু ভর্ৎসিত ও সমালোচিত হতে লাগলেন। এই বিড়ম্বনা কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জাপানে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁর সামনে বসে সরাসরি আলোচনা করে প্রকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা করে জাপানের নীতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপ ধারণার নিরসন করবেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ দিয়ে সঠিক কথাটি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেবেন। সেই কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জাপানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন; কিন্তু বিশ্বকবি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তবে কবি কিন্তু তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কবি দ্বিতীয় জাপান ভ্রমণের সময় (১৯২৪) রাসবিহারীর বাসস্থানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে ফোটোও তুলেছেন; এমনকী একবার যখন কবি শুনলেন যে জাপানের তীব্র ভূমিকম্পে রাসবিহারীর বাসগৃহ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তখন কবি বিশ্বভারতী থেকে ছয়শো টাকা তাঁকে টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তিনি দমে না গিয়ে পাশ্চাত্য শক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীদের সচেতন ও ঐক্যতাবদ্ধ করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যেই তিনি 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' (আইআইএল) গঠন করেছেন। এর ৩০ জন ভারতীয় সদস্যকে নিয়ে তিনি টোকিয়োর 'রে বো' রেস্টুরেন্টে এক সভায় বসলেন। এই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হলো--- 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' (Asia for Asian), শ্বেতাঙ্গরা যেন নিজেদের দেশে ফিরে যান। 'আমরা এশিয়াবাসীরা নিজেদের বিবাদ নিজেরা মেটাবো' ইত্যাদি। এসব প্রস্তাব জাপানের প্রধানমন্ত্রী, চীনের রাষ্ট্রদূত ও ভারতের কংগ্রেস কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হলো। এ ব্যাপারে জনমত গঠন করার জন্য সারা জাপান ঘুরে ঘুরে রাসবিহারী সভাসমিতি করে তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। ১৯৩৭ সালের ২৮ অক্টোবর টোকিয়োতে এশিয়াবাসী যুবক মণ্ডলীর এক সম্মেলন করেন তিনি। সেই সম্মেলনে জাপানি, ভারতীয়, থাইল্যান্ডবাসী, ইন্দোনেশিয়াবাসী, মঙ্গোলিয়াবাসী ইত্যাদি বহু এশিয়ান সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। রাসবিহারীর 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' 'Asia for Asians' এই স্লোগান দিকে দিকে উচ্চারিত হতে থাকল। রাসবিহারীই প্রথম যিনি বিশ্ববাসীর কাছে এই বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ বীজমন্ত্র জাপান ও চীনের সাধারণ জনগণের মনে প্রবেশ করে গেল। জাপানের জনসাধারণ এবং জাপানের সরকার 'এশিয়া এশিয়াবাসীর' এই ডাকে সাড়া দিলেন এবং এশিয়ার প্রাধান্য রক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। আশ্বস্ত হলেন রাসবিহারী বসু।

এভাবে জাপানবাসীর মনোজগতে প্রবেশ করে, তাঁদের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে ভারতের আবেগ অনুভূতির মিশ্রণ ঘটিয়ে ভারত ও জাপানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক ও নিরলস প্রয়াস করেছিলেন রাসবিহারী বসু এবং সফল হয়েছিলেন। দু' দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছিল। ভারত-জাপান মৈত্রী সুদৃঢ় হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান সরকার রাসবিহারী বসুকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করার জন্য প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এবং তারপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' জাপানি সহায়তায় পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশ ও মার্কিন মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে অন্য ইতিহাস। তাঁর মহৎ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাপান সরকার মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর মতো কোনো বিদেশিকে সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান— 'Order of the Rising Sun' প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র : ১. কর্মবীর রাসবিহারী— অধ্যাপক বিজন বিহারী বসু। ২. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ। ৩. Revolutionaries--- Sanjeev Sanyal.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুনর্লিখন হলো সময়ের দাবি

১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে স্কুল-কলেজ স্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এমনভাবে পড়ানো হয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এটাই বুঝেছে— একমাত্র কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই লড়েছে এবং অন্যান্যরা বিক্ষিপ্তভাবে কিছুটা লড়াই করে। কিন্তু এটা সঠিক তথ্য নয়। বহু বরেণ্য বিপ্লবী এবং তাঁদের সংগঠন নানান পরিকল্পনা করে এবং তাঁদের দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে সামনে রেখে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন আগ্নেয় প্রতিরোধ। এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসের বিবরণ উপস্থাপন যদিও প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

জনজাতি সমাজের বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মাধ্যমে। ব্রিটিশের পদলেহী ইতিহাসবিদরা 'মহাবিদ্রোহ'কে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার লড়াইয়ের স্বীকৃতি না দিলেও স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন যে, রানি লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, কানোয়ার সিংহ ও মঙ্গল পাণ্ডের আত্মত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ভারতের ইতিহাসে।

এই অধ্যায়ের পর স্মরণ করতে হয় বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-র নাম, যিনি মনে করতেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ভারতের দুর্গতিমোচন সম্ভব নয়। ভারতের স্বাধীনতাকে জীবনব্রত করে তিনি— কোল, ভীল, মাহার, রামোশি, ধাঙড় প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে গঠন করেন একটি বিপ্লবী দল। এই বিপ্লবী সংগঠনটি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি খাজাঞ্চিখানা অধিকার করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ অর্জন করে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের ঝটিতি গেরিলা আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রের সমকালীন ইংরেজ প্রশাসন। বিদ্রোহী জনসাধারণের কাছে তিনি 'কাশীকা বাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। জনৈত ভারতীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সমসাময়িক আরও একজনের নামোচ্চারণ না করলে এই ইতিহাস আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তিনি হলেন— সদ্গুরু রাম সিংহ কুকা। তিনি হলেন একজন শিখ ধর্মগুরু, যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিদেশি বস্ত্র বর্জন আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৬৭-তে চিনি সমাজ সংস্কার এবং কুকা আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে রেঙ্গুনে পাঠায়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সমসাময়িক আরও একজন পণ্ডিত, দার্শনিক তথা ভারতীয় জাতীয়তার অন্যতম জনক হলেন মহারাষ্ট্রের নেতা এবং পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ-র সঙ্গী মহর্ষি আন্নাসাহেব পটবর্ধন, যাঁর প্রভাব মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও বঙ্গে স্মরণীয়। লাল-বাল-পাল নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তিনিই প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল— স্বামী বিবেকানন্দের ইহলোক ত্যাগের ঠিক পরেই এই ত্রয়ী এবং শ্রীঅরবিন্দ, বাঘা যতীনের নেতৃত্বে জ্বলে ওঠে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশ। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, মুক্তিসঙ্ঘ, শ্রীসঙ্ঘের মতো বিপ্লবী সংগঠন তৈরি হয় এই সময়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আলোড়িত হয়ে সারা দেশে জ্বলে ওঠে বিপ্লবের আগুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিপ্লবী আন্দোলন তৈরি করে ভারত জননীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে, যিনি এই সময় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে বহিষ্কৃত হন স্কুল থেকে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অসংখ্য বিপ্লবীর আত্মত্যাগের বর্ণনা এক পৃষ্ঠায় তুলে ধরা ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁরা প্রত্যেকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদনা করেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা এবং তাঁর ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ শুরু করেন 'যুগান্তর' পত্রিকা। বিপ্লবীদের সম্পাদিত এই পত্রপত্রিকাগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। তিলকের জেল, লালা লাজপত রায়ের ওপর পুলিশি নির্যাতন, প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে বিপিনচন্দ্র পালের অবসরগ্রহণ এবং শ্রীঅরবিন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ— এই আন্দোলনের ঝাঁঝ সাময়িকভাবে কমিয়ে দিলেও, তাঁদের মহান আদর্শ পরের প্রজন্মকে ব্যাপতভাবে উদ্বুদ্ধ করে যায়।

এই সময়পর্বে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, সুফি আম্বা প্রসাদ, নলিনীকান্ত বাগচী। ১৯১২ সালে দিল্লিতে বড়োলাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। লন্ডনে 'ইন্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। লন্ডনেই মদনলাল ধিংড়া হত্যা করেন কার্জন ওয়াইলিকে। দ্বীপান্তরে দু'টি যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজাপ্রাপ্ত হন বীর সাভারকর। জালিওয়ানওয়ালাবাগ পরবর্তী যুগে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি-র শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় এবং রামপ্রসাদ বিসমিলের আত্মত্যাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' এই সময় টলিয়ে দেয় মিথ্যা অহিংসা তত্ত্ব এবং হিপোক্রিট আন্দোলনকে। বিপ্লবী ভগৎ সিংহ, সুখদেব, রাজগুরুর ফাঁসি, দীর্ঘ অনশনে বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যু, অন্যান্য বিপ্লবীদের যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি নাড়িয়ে দেয় দেশকে। এই দেশ যেন ভুলে না যায় শ্রীসঙ্ঘের বিপ্লবী অনিল দাস এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রভাংশু শেখর পাল, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্তর মতো মহান বিপ্লবীদের। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ অধ্যায় হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর একটি অনুষ্ঠানে এসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীকে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বলেন, তাদের ভারত ছাড়ার কারণ গান্ধীর ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন নয়। আসল কারণ হলেন— 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। ১৮৫৭-১৯৪৭—৯০ বছর ব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যেক বিপ্লবীর ভূমিকা সমান। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪৮)

শোকাঘাত

ভাউজী কাওরে ছিলেন ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবে 'ঘনিষ্ঠ' শব্দ দিয়ে তাদের সম্পর্কের গভীরতা ঠিক প্রকাশ হয় না। বলা যায় দুটি মানুষ এক হৃদয়। যাকে বলে অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্ব। বৈপ্লবিক কাজ থেকে শুরু করে সঙ্ঘ শুরু পর্যন্ত সব কাজে তিনি ছিলেন অন্যতম সঙ্গী। তবে বৈপ্লবিক কাজে তিনি ছিলেন গভীর বিশ্বাসী। ডাক্তারজীর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা এবং সেই সময় বিপ্লবী আন্দোলনে কিছু শিথিলতা এলেও অস্ত্র সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ, বিলিবণ্টন কাজে তিনি থাকতেন সদা তৎপর। এ ব্যাপারে ডাক্তারজীরও সহযোগিতা ছিল। সঙ্ঘের শাখা শুরুর বিষয়ে হিঙ্গলীর মতো বহু স্থানে তিনি ছিলেন ডাক্তারজীর সহযোগী। নাগপুর থেকে কিছু দূরে সেলু তালুকের ঘোরাড়ে কাওরেজীর কৃষি জমি ছিল। তিনি কবিরাজীও করতেন। বৈপ্লবিক কাজ মন্দা পড়ায় তখন তিনি সেলুঘোরাড যাতায়াত করতেন। সেখানে কৃষিকাজ করার জন্য কয়েকদিন থেকে আবার ফিরতেন নাগপুরে। এরকম একবার এক মাসের জন্য যাচ্ছি বলে তিনি সেলুঘোরাড গেলে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায় কোনো দূর গ্রামের অসুস্থ রোগীর খবর এলে কর্তব্যের তাগিদে হেঁটেই তার চিকিৎসার জন্য যান। এত ধকল শরীর সইলো না। তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজের ওষুধে কাজ হলো না, কথা বন্ধ হয়ে গেল। নাগপুরে সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারজী কাওরেজী পরিবারের সকলকে নিয়ে সেখানে গেলেন। যাবার পথে ওয়ার্ধা থেকে ডাঃ দেশমুখকে সঙ্গে নিলেন। তিন দিন চিকিৎসার সব রকম প্রয়াস করা হলো কিন্তু কোনো ফল হলো না। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা মানুষটি ডাক্তারজীর কোলে মাথা রেখে অসীমের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর চোখের সামনে বন্ধুর অন্তিম যাত্রা চাক্ষুষ করেও কিছু করতে পারলেন না।

এই কষ্ট ডাক্তারজীর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ঘোরাড নদীর ধারে অন্তিম সংস্কারের সময় এক টিলার উপর একা বসে ডাক্তারজী শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন। এমন করুণ দৃশ্য অনেকের মনেই গেঁথে আছে। পরে যখনই ভাউজীর কথা ডাক্তারজীর স্মরণে আসতো তিনি শোকাকুল হয়ে পড়তেন। ১৯২৮ সালে প্রথম সঙ্ঘ শিবিরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবকদের একটা পথসঞ্চলন ছিল। ডাক্তারজী শিবিরে আগত অতিথিদের আনন্দের সঙ্গে পথ সঞ্চলন দেখাচ্ছিলেন, এমন সময় কাওরেজীর একজন অনুগামী সেখানে এলেন। তাকে দেখেই ডাক্তারজীর ভাউজী কাওরের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি সেই ব্যক্তিকে পাশে ডেকে নিয়ে বললেন— 'এমন সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য ভাউজী আজ বেঁচে নেই'। এই বলে ডাক্তারজী আবেগে কাঁদতে লাগলেন। এত প্রেম, এত বন্ধুপ্রীতি, এত গভীর ভালোবাসা। আসলে এটাই সঙ্ঘ, এটাই সংগঠন, এটাই সঙ্ঘতত্ত্ব।

(৪৯)

প্রথম গুরু পূজন

'আগামীকাল গুরুপূজনের কার্যক্রম হবে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রদ্ধা অনুসারে ফুল ও দক্ষিণা নিয়ে আসবেন'। ১৯২৮ সালে গুরু পূর্ণিমার ঠিক আগের দিন ডাক্তারজী সকলকে এই ভাবে অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে দিলেন। ডাক্তারজীর কথা শুনে স্বয়ংসেবকরা খুব আনন্দ অনুভব করলো। তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। কেউ বললো— 'কাল আমরা গুরু হিসেবে ডাক্তারজীকে পূজা করার সুযোগ পাব'। ডাক্তারজীর প্রজ্ঞা, ত্যাগ নিষ্ঠা, পরিশ্রম, রাষ্ট্র চেতনা ও দেশ ভক্তির প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রয়েছে। আবার কেউ বললেন— 'পূজন আন্না সোহনীর করা হবে'। সঙ্ঘ শাখার দৈনন্দিন কার্যক্রমের পরিকাঠামো তৈরি করতে আন্না সোহনীর অবদান তারা সকলে চাক্ষুষ করেছে। কিন্তু তাদের এমন সব ধারণার নিরসন হতে খুব সময় লাগলো না। পরেরদিন ধ্বজোত্তোলনের পরে গৈরিক পতাকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ংসেবকদের উদ্দেশে ডাক্তারজী তাঁর ভাষণে বললেন— 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনো ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বলে স্বীকার না করে পরম পবিত্র ভগোয়া ধ্বজকে গুরু বলে গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি যতই মহৎ হোক না কেন, তাঁর মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। তাছাড়া একথা বলা যায় না যে ব্যক্তি চিরকাল অবিচল থাকবে। তত্ত্ব সর্বদা অটল থাকে। সেই তত্ত্বের প্রতীক ভগোয়া ধ্বজও অটল। এই ধ্বজের দর্শন মাত্র রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরম্পরা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যে ধ্বজকে দেখে মনের মধ্যে স্ফূর্তির সঞ্চার হয় সেই ভগোয়া ধ্বজই আমাদের তত্ত্বের প্রতীক রূপে আমাদের গুরু স্থানে স্থিত আছে। সঙ্ঘ সেই কারণে কোনো ব্যক্তিকে গুরু স্থানে রাখতে চায় না।'

বক্তব্য শেষ করে ডাক্তারজী প্রথম দক্ষিণা সমর্পণ করলেন। প্রথম গুরুপূজনে দক্ষিণা রূপে মোট চুরাশি টাকা কয়েক আনা সমর্পিত হয়েছিল। একজন স্বয়ংসেবক আধ-পয়সা অর্পণ করেছিল। সমর্পণের এই অভিনব পন্থা ডাক্তারজী প্রণয়ন করলেন সঙ্ঘের আত্মশক্তি জাগরণের জন্য, সংগঠনের মর্যাদা, নিষ্ঠা, তত্ত্ববোধকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে। একটা সংস্থা পরিচালনার জন্য অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন। ডাক্তারজীর বন্ধু, পরিচিত মহল, সাধারণের মধ্যে একটা প্রভাব ছিল যে প্রয়োজনে অর্থ চলেও আসতো। কিন্তু চিন্তা ছিল ভিন্ন পথে। তিনি বললেন— অর্থ লাভই কোনো সংস্থার মঙ্গল সাধনের সহায়ক হতে পারে না যদি তা শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত না হয়। সংস্থার প্রতি প্রেম, ভালোবাসা শ্রদ্ধার মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় তার দ্বারাই কল্যাণকর কার্য সম্পাদন সম্ভব। এই তত্ত্ববোধের অনুভূতিতে ডাক্তারজী গুরুদক্ষিণা সমর্পণের পদ্ধতি স্বয়ংসেবকদের মধ্যে প্রচলন করেছিলেন। আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না বিশ্বজুড়ে মহীরুহ রূপী এই সঙ্ঘশক্তির অন্তর্নিহিত সত্য হলো— সমর্পণ মানসিকতা নির্মাণ করা।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস